গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

সিঙ্গুর আন্দোলনের শহিদ তাপসীর প্রতি এই অশ্রদ্ধা মেনে নেওয়া যায় না

পশ্চিমবাংলায় সিপিএমের ফ্যাসিস্ট-সুলভ অত্যাচারী শাসনের অবসানে সিঙ্গুর-আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা কারও অজানা নয়। কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলনে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের নাম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনে যে অষ্টাদশী কিশোরীর মর্মান্তিক মৃত্যু রাজ্যের বিবেককে আলোড়িত করেছিল, তাঁর নাম তাপসী মালিক। ২০০৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর তৎকালীন শাসক সিপিএমের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মেরেছিল তাঁকে। তাঁর মৃত্যুদিবসে এবার তৃণমূলের পক্ষ থেকে যে 'উৎসবে'র আয়োজন করা হয় তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, শহিদের প্রতি তা চরম অশ্রদ্ধা, একে মেনে নেওয়া যায় না।

সে বছর ঠিক ১৮ ডিসেম্বরের আগের দিনই ছিল সিঙ্গুরের বাজেমেলিয়ায় জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে এলাকার সমস্ত শিশু-কিশোরদের অবস্থান ও গণঅনশন কর্মসূচি। এই কর্মসূচির অন্যতম সংগঠক ছিলেন তাপসী। সেই তাপসীর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ মাঠে পড়ে থাকতে দেখে কেঁদেছিল এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা। যা দেখে তখন তাপসীর চরিত্র হননে মত্ত সিপিএম নেতারা এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের কটাক্ষ করেছিলেন। তাপসীর এই নৃশংস মৃত্যু বাংলা জুড়ে প্রবল আলোড়ন তোলে। মানুষকে শোকস্তব্ধ করে দেয়। শাসক সিপিএমের বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা এবং ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ২৩ ডিসেম্বর রাজ্যব্যাপী শোকদিবস পালনের আহ্বান জানায়। মানুষ তাতে অভূতপূর্ব সাড়া দেন। সমস্ত জেলায় অসংখ্য স্থানে তাপসীর স্মারকবেদি স্থাপিত হয়। সাধারণ মানুষ, ক্লাব, বাজার সমিতি স্মারকবেদিতে মাল্যদান করে কালো ব্যাজ ধারণ করেন। ইতিপূর্বে ঐ সিঙ্গুরেই পুলিশি অত্যাচারে শহিদ হন যুবক রাজকুমার ভুল। রাজকুমার-তাপসীর আত্মদানের আগুন থেকে সিঙ্গুরের মানুষ জ্বালিয়ে নেন অসংখ্য মশাল। নতুন উদ্যমে শুরু হয় আন্দোলন, যা রাজ্য জুড়ে দাবানলের সৃষ্টি করে। সিপিএমের চৌত্রিশ বছরের অপশাসন সেই দাবানলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাপসী মালিক এই নাম পরিণত হয় সংগ্রামের প্রতীকে, ১৮ ডিসেম্বর অক্ষয় হয় শহিদ দিবস রূপে।

তিনের পাতায় দেখুন

তীব্র বেকারত্বে জর্জরিত যুবসমাজ
প্রতিবাদ বিশ্ব জুড়ে

পুঁজিবাদী পণ্ডিতরা মাথা খাটিয়ে নতুন এক বোমার কথা আবিষ্কার করেছেন। বেকার বোমা। বিশ্বজুড়ে এই বোমা নানা জায়গায় ফাটতে শুরু করেছে, আর তাতেই এই বোমার কথা টের পেয়েছে শাসকরা।

গোটা বিশ্ব আজ তীব্র বেকার সমস্যায় জর্জরিত। রাষ্ট্রসংঘের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইউরোপ জুড়ে বেকারি চল্লিশ শতাংশ, মিশর এবং তিউনিশিয়ায় পঞ্চাশ শতাংশ। ভারতের লেবার ব্যুরো ২০১২-১৩ সালের যে কর্মসংস্থান ও বেকারির রিপোর্ট বের করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, গ্র্যাজুয়েট বেকারের পরিমাণ গত বছর ছিল ১৯.৪ শতাংশ। এ বছর বেড়ে ৩২ শতাংশে পৌঁছেছে। বহু দেশেই এই পরিমাণ চল্লিশ এবং পঞ্চাশ শতাংশের মধ্যে। এই তথ্যগুলি সবই সরকারি। সবাই জানে, এই সব ক্ষেত্রে প্রকাশিত তথ্য সব সময়েই কম করে দেখানো হয়। যারা আংশিক সময় কাজ করে বা ছদ্মবেকার তাদের এই বেকার তালিকায় ধরাই হয় না।

ক্রমাগত বাড়তে থাকা এই সংকট থেকে বেরোনোর কোনও রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছে না পুঁজিপতি শ্রেণি। ফলে দেশে দেশে শোষিত মানুষের প্রতিবাদী আন্দোলনগুলিও ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে। অনেকেই মনে করেন, সামাজিক সংকট নিয়ে আজকের যুবসমাজ তেমন একটা ভাবে না। বাস্তব বলছে, বিশ্বজোড়া এই আন্দোলনগুলিতে যুব সমাজের অংশগ্রহণ আজ চোখে পড়ার মতো। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। গত বছর দিল্লিতে দামিনীকে ধর্ষণ করে খুনের প্রতিবাদে যে লাগাতার আন্দোলন হয়েছিল যুবকরাই ছিল তার নেতৃত্বে। গত ১২ নভেম্বর কলকাতায় মহামিছিলে যে প্রায় ৫০

দুয়ের পাতায় দেখুন

'দামিনী'দের অসম্মান রুখতে
চাই সংগ্রামী যৌবন

সেদিন সারা দেশ শুধু কুর্নিশ করেছিল তাই নয়, গভীর আশা ভরা চোখে তাকিয়ে ছিল ওদের দিকে। গণতন্ত্রের তথাকথিত পীঠস্থান সংসদ ভবন, রাষ্ট্রপতি ভবনের শীতল পাথরের দেওয়ালে ওদের দৃপ্ত স্লোগান প্রতিধ্বনি তুলেছিল। গণতন্ত্রের শান্তিরক্ষকরা ওদের মধ্যে দেখেছিল বিপদ। তাই পুলিশের লাঠি ওদের চামড়া কেটে বসে যাচ্ছিল, বিলাসের উষ্ণ ওমের মধ্য থেকে দেশের পরিচালক মন্ত্রীরা পুলিশকে আদেশ দিয়েছিলেন তীব্র শীতের দিনে, এমনকী রাতেও ওদের জল কামানের তোড়ে ভিজিয়ে দিতে। তবু ওরা ছিল অনড়। দিল্লির সরকার একের পর এক মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দিয়েছিল যাতে ওরা বিক্ষোভের স্থানে পৌঁছতেই না পারে। জারি হয়েছিল কত নিষেধাজ্ঞা, এমনকী ওদের কারও কারও বিরুদ্ধে পুলিশ এনেছিল খুনের মিথ্যা মামলা। তবুও সেদিন এমন কোনও শক্তি ছিল না যা ওদের আটকে রাখবে। ২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বরে দিল্লির যে ছাত্রীটির উপর নারকীয় অত্যাচারের প্রতিকার চেয়ে দিল্লির এই যুব সমাজ রাস্তায় নেমেছিল তাকে তারা চিনতও না হয়ত। তবু ওরা রাস্তায় নেমেছিল। কারণ, এই দেশের সর্বত্র মহিলাদের উপর বেড়ে চলা নির্যাতন দেখেও নির্বিকারভাবে দৈনন্দিন জীবনের ছন্দ অব্যাহত রাখাটা ওদের যৌবন মানতে চায়নি। এ দেশের সরকার, পুলিশ প্রশাসন যে কিছু করবে না, তা ওরা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে। বধির এই রাষ্ট্রের কানে ওরা তীব্র চিৎকারে বলতে চেয়েছিল, এ জিনিস আর সহ্য করা যায় না।

২৯ ডিসেম্বর, ভোরের আলো ফোটার আগেই

চারের পাতায় দেখুন

মূল্যবৃদ্ধি, নারী নির্যাতন, বন্যা-খরা প্রতিরোধে ভুবনেশ্বরে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল

৯ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি) ওড়িশা রাজ্য কমিটির আহ্বানে বিধানসভার সামনে ১০ হাজারেরও বেশি মানুষের সমাবেশ (সংবাদ দুয়ের পাতায়)

তীব্র বেকারত্বে জর্জরিত যুবসমাজ

একের পাতার পর

হাজার মানুষ যোগ দিয়েছিল তারও সিংহভাগই ছাত্র-যুবক। আন্তর্জাতিকভাবেই বহু বিষয় নিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে, যেগুলিতে যুবকরাই নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই আন্দোলনগুলি রাজনৈতিক চরিত্রে কোথাও ভিন্ন হলেও আন্দোলনের অভিমুখ যে বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকটের বিরুদ্ধে তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার আগে দেখা যাক, কীভাবে পুঁজিবাদী সংকট যুবসমাজের উপর প্রভাব ফেলছে।

বর্তমানে বিশ্ব জুড়ে বেশি বেশি সংখ্যক যুবকদের মূলত তিনটি পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এক, কম বেতনে কাজ করা— যেখানে সুযোগ-সুবিধা কিছুই নেই, দুই, কাজ না পাওয়া, অথবা তিন, কোনও দুষ্কর্ম করে জেলে যাওয়া। জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশই এইভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে— যা মানবসম্পদের বিরাট অপচয় ছাড়া কিছু নয়। এই ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে, পুঁজিবাদের বর্তমান সংকট কতটা গভীর এবং ব্যবস্থা হিসেবে তা নিজেই উৎপাদন প্রক্রিয়ার সামনে একটা বিরাট বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

মারাত্মক এই সংকট থেকে রেহাই পেতে দেশে দেশে প্রায় সব বুর্জোয়া সরকারই জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয়সংকোচ করছে, বাজেটে বরাদ্দ ছাঁটাই করছে। সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রকল্পগুলিকে বন্ধ করে দিচ্ছে। অথচ এগুলি সবই শ্রমিক-কর্মচারী-সাধারণ মানুষের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছিল। সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ নেমে আসছে শিক্ষার উপর। সরকারি স্কুলগুলি হয় বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, নয় বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের ছাঁটাই করা হচ্ছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি বাড়ছে রকেট গতিতে। ব্যাঙ্কগুলি জনগণের সম্পত্তি গ্রাস করছে এবং শিক্ষার জন্য ঋণ নেওয়া ছাত্রদের বাধ্য করছে তাদের ভবিষ্যৎ ব্যাঙ্কের কাছে বাঁধা রাখতে। সরকারি নীতির লক্ষ্য হল, শিক্ষাকে শুধুমাত্র সচ্ছল অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। শাসক শ্রেণি দরিদ্র নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করছে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি একইরকম। চিকিৎসা সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার বর্বরতা, অবিচার এবং অমানবিকতাকে যে নামমাত্র আড়ালটুকু দিয়ে ঢেকে রাখত, যত দিন যাচ্ছে ততই সে-আড়ালটুকুও খসে পড়ছে। প্রতিকার চেয়ে দেশে দেশে শোষিত, নির্যাতিত মানুষ, বেকার যুবসমাজ নেমেছে প্রতিরোধ আন্দোলনে।

এই আন্দোলন প্রথম শুরু হয় তিউনিশিয়া এবং ইজিপ্টে। তার ফলেই সেখানকার মার্কিন মদতপুষ্ট স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটে। এ ক্ষেত্রে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেখানকার বিশাল বেকার যুবক বাহিনী।

স্পেনেও সরকারি ব্যয় সংকোচ এবং ব্যাপক বেকারি, যা সাধারণভাবে ২০ শতাংশ এবং যুবকদের ৪৫ শতাংশে পৌঁছেছে, তার বিরুদ্ধে গোটা দেশ জুড়ে প্রবল বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। বিক্ষুব্ধ মানুষ শহরের পার্কগুলি দখল করে নেয় এবং সেখানে প্রায় মাসাধিক কাল ধরে বিক্ষোভ চলে। এই বিক্ষোভ একসঙ্গে ১৫০টি শহরে অনুষ্ঠিত হয়। যুবকরা শ্লেষের সাথে নিজেদের 'অযোগ্য' বলে পরিচয় দিতে থাকে, যাদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। এই কথার মধ্য দিয়ে আসলে তারা গোটা বিশ্বের যুবকদের দুরবস্থাই তুলে ধরে।

গ্রিসে, যেখানে শ্রমিকদের উপর আক্রমণ সবচেয়ে মারাত্মক এবং সরকারি ব্যয়সংকোচও ব্যাপক, সেখানকার প্রতিবাদী আন্দোলনও তুঙ্গে। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে একের পর এক উত্তাল ধর্মঘট হয়েছে দেশ জুড়ে। সেই ধর্মঘটে যুবকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ছাত্ররা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে এসে ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে। গত জুনে এথেন্সে পার্লামেন্টের সামনে ৫০ হাজার ছাত্র-যুবক দেশজোড়া আন্দোলনের সমর্থনে জমায়েত হয়েছিল।

ইংল্যান্ডে ২০১১-র আগস্টে সরকারি দমননীতি, বর্ণবৈষম্য, বেকারি এবং ব্যয়সংকোচের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছিল। তার সামনের সারিতে ছিল যুবকরা, বিশেষত কৃষ্ণাঙ্গ এবং অভিবাসী যুবকরা।

চিলিতে ছাত্ররা শিক্ষায় ব্যয়বৃদ্ধির প্রতিবাদে মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে ধর্মঘটে ফেটে পড়েছে। তামার খনির শ্রমিকদের এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিকদের আন্দোলনের সমর্থনে ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করেছে।

এই প্রতিবাদী আন্দোলনই এমনকী মার্কিন দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। মালিকদের সাথে বেতন ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে দর কষাকষি এবং অন্যান্য অধিকারে হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে রাজধানী ওয়াশিংটন সহ দেশজোড়া লাগাতার শ্রমিক বিক্ষোভের পিছনে যুবকদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই আন্দোলনই ধীরে ধীরে 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' আন্দোলনে পরিণত হয়। অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন দেশ জুড়ে মানুষের বিক্ষোভকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে দিতে এবং একই সাথে জনপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হয়। ব্যাপক বেকারি এবং একের পর এক সরকারি আক্রমণের মুখে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে হতাশা এবং বিভ্রান্তি কাজ করছিল এই আন্দোলনই তা অনেকাংশে কাটিয়ে দিয়েছে। এ প্রশ্নও উঠছে, সমস্যার উৎস যেখানে পুঁজিবাদ, সেখানে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ ছাড়া সমস্যার নিরসন কীভাবে সম্ভব? সম্ভবত এই প্রশ্নই তাদের সংগ্রামের সঠিক দিশা দেখাবে।

প্রবীণ পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

মধ্যপ্রদেশের জবলপুর জেলা সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড আর এন বর্মা ৪ ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

কর্মোপলক্ষে রাউরকেল্লায় গিয়ে ১৯৬২ সালে তিনি দলের সংস্পর্শে আসেন। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড তাপস দত্তের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে তিনি ট্রেড ইউনিয়নের সক্রিয় সংগঠক হয়ে ওঠেন এবং মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে সংগ্রাম শুরু করেন।

প্রয়াত কমরেড বর্মার স্মরণে ১৪ ডিসেম্বর জবলপুরে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দলের ওড়িশা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শংকর দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, কমরেড বর্মা খুব উদার হৃদয় মানুষ ছিলেন। তিনি যেখানেই যেতেন, যাদের সাথেই মিশতেন, তাদের কাছে পার্টির চিন্তা নিয়ে যেতেন এবং তাদের দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করতেন। এই প্রক্রিয়াতেই তিনি পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনকে দলের সমর্থকে পরিণত করেন। তিনি দলের কাজকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন এবং বহু বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আমৃত্যু পার্টির শিক্ষা নিয়েই চলার চেষ্টা করে গেছেন।

সভার সভাপতি দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড উমাপ্রসাদ বলেন, কমরেড বর্মার মধ্যে শোষিত নিপীড়িত জনগণের প্রতি দরদবোধ, সত্যনিষ্ঠা, পার্টির সিদ্ধান্তে অটল থাকা প্রভৃতি গুণ দেখা যেত। কারণ তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আপন জীবনসংগ্রাম পরিচালনা করতেন।

কমরেড আর এন বর্মা লাল সেলাম

প্রবীণ পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

কলকাতা জেলা কমিটির অন্তর্ভুক্ত বাওয়ালি-সাতগাছিয়া লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড অমিয় দাস (মিন্টুদা) দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গত ১১ ডিসেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। বিভিন্ন বামপন্থী দলের আদর্শহীনতায় বীতশ্রদ্ধ ছিলেন কমরেড অমিয় দাস। ১৯৭৭ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে তিনি এস ইউ সি আই (সি)-র সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে স্থানীয় এস ইউ সি আই (সি) নেতৃবৃন্দ তাঁর বাড়িতে গিয়ে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। মরদেহ বাওয়ালি পার্টি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদকের পক্ষে মাল্যদান করেন বাওয়ালি-সাতগাছিয়া লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড অজয় ঘোষ। অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা মাল্যদান করেন। একসময় এলাকায় দলের কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকলেও বয়স ও অসুস্থতার জন্য তিনি ধীরে ধীরে ঘরবন্দি হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দলের খোঁজখবর নিয়মিত রাখতেন।

কমরেড অমিয় দাস লাল সেলাম

ঝাড়গ্রামে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ

১৯ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত শত শত মানুষের মিছিল ঝাড়গ্রাম শহরের বিক্ষোভ সমাবেশ স্থলে পৌঁছায়। দাবি ছিল কালোবাজারি, মজুতদারদের দমন করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা, সিপিএম আমল থেকে জঙ্গলমহলের সর্বত্র পুলিশ, যৌথবাহিনী, শাসক দলের ক্রিমিনালদের ক্যাম্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং পুলিশ-ক্রিমিনালদের দ্বারা ধর্ষিতা মা-বোনেদের ক্ষতিপূরণ,অপরাধীদের কঠোর শাস্তি, জব কার্ড হোল্ডারদের ২০০ দিনের কাজ ও ২৫০ টাকা দৈনিক মজুরি, বিড়ি শ্রমিক-নির্মাণকর্মী-মোটরভ্যান চালক সহ সমস্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা ও মজুরি বৃদ্ধি, হাসপাতালে পর্যাপ্ত ওষুধ, বিদ্যুতের দাম কমানো ইত্যাদি। সমাবেশের প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি। সভাপতিত্ব করেন কমরেড কমল সাঁই। ৭ সদস্যের প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে।

ভুবনেশ্বরে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল

ওড়িশায় বিজেডি সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ৯ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি) ওড়িশা রাজ্য কমিটির আহ্বানে বিধানসভার সামনে এক বিশাল সমাবেশে ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ বিক্ষোভ মিছিল করে যোগ দেন। এক প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ১৩ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন। বন্যা-খরা-সাইক্লোন প্রতিরোধে স্থায়ী ব্যবস্থা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু, মজুতদারি-কালোবাজারি বন্ধ, শিক্ষায় পাশ-ফেল চালু করা, মহিলাদের উপর অত্যাচার বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। এই মিছিলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সর্বাত্মক শোষণ যন্ত্রের প্রতীক হিসেবে একটি অক্টোপাসের মডেল প্রদর্শিত হয়। বিধানসভার সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কমরেড বিষ্ণু দাস। রাজ্য সম্পাদক কমরেড ধূর্জটি দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

মহিষবাথানে খেলার মাঠ বাঁচাতে নাগরিক উদ্যোগ

কমরেড তরুণ নস্করের চিঠি পূর্তমন্ত্রীকে

ভি আই পি রোড-কেষ্টপুর ক্রসিংয়ে ভিড় সামলাতে একটি ফ্লাইওভার তৈরির কাজ চলছে। কিন্তু তা করতে গিয়ে যেভাবে দুটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের খেলার মাঠ দখল করা হয়েছে ও কালক্রমে মাঠ দু'টি ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়েছে, তার প্রতিবাদে এলাকার মানুষ সরব হয়েছেন। তাঁরা মহিষবাথান কৃষ্ণপুর উন্নয়ন সমিতি (রবীন্দ্রপল্লী) গঠন করে খেলার মাঠ রক্ষার দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন। গণদরখাস্তে আরও বলা হয়েছে, এই ফ্লাইওভারের জন্য ভি আই পি রোডকে প্রসারিত করা হবে ও তা স্কুলগুলির দেওয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যাবে, যেটা অনিবার্যভাবে দূষণ সৃষ্টি করবে ও তার প্রভাব পড়বে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর।

উন্নয়ন সমিতির প্রতিনিধিরা বিষয়টি নিয়ে বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্করের সহায়তা চান। তিনি ২৫ নভেম্বর রাজ্য পূর্তমন্ত্রীকে ঐ গণদরখাস্ত সহ একটি চিঠি দেন ও এই সমস্যায় হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানান।

এই অশ্রদ্ধা মেনে নেওয়া যায় না

একের পাতার পর

কিন্তু এ বছরের ১৮ ডিসেম্বর যেন অন্য রূপে বা আসল রূপে দেখা দিলেন কর্তাব্যক্তিরা। শহিদ স্মরণের নামে শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা এসেছিলেন। ট্রাকে করে বহু দূর দূর থেকে শয়ে শয়ে লোক আনা হয়েছিল। নাচ-গানের ব্যবস্থা হয়েছিল, ম্যাজিক শো, রক্তদান, সকলের জন্য বিনা পয়সায় কফির ব্যবস্থা, ১০টি উনুন জ্বেলে চার হাজার মানুষের খাওয়ার অঢেল আয়োজন, সবই ছিল। মন্ত্রী এবং পারিষদদের জন্য এসেছিল চিকেন বিরিয়ানির শতাধিক প্যাকেট। শোক নয়, সংগ্রামের শপথে স্মরণ নয়, ছিল একটা পিকনিকের মেজাজ। শুধু ছিলেন না যাঁদের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে এই আয়োজন, যাঁদের মন ভোলাতে ভুরিভোজের ব্যবস্থা, সেই তাঁরা— সিঙ্গুরের জমিহারা অনিচ্ছুক চাষিরা ।

গত কয়েক বছরে তাঁরা দেখেছেন, শহিদ স্মরণের নামে এই উৎসবে কোথাও তাপসী মালিকের আত্মদানের কথা নেই, সিঙ্গুরের জমিহারা কৃষকের জীবনের সংকটের কথা নেই, জমি ফেরানোর আন্দোলনের কথা নেই, রয়েছে শুধু আইনের শুকনো কচকচি আর নেতাদের কিছু মামুলি বক্তৃতা। তাতে আজ আর সিঙ্গুরের মানুষের কোনও আগ্রহ নেই। না হলে সিঙ্গুরের সভা ভরাতে লরি করে বাইরে থেকে লোক আনতে হবে কেন।

সিঙ্গুরের জমিহারা চাষিরাই প্রশ্ন তুলেছেন, একে কি শহিদ স্মরণ বলে? যে তাপসীর মৃত্যুতে একদিন গোটা বাংলার বিবেক কেঁদেছে, তাঁর মৃত্যু দিবসে এই মোচ্ছব কেন? তাঁরা বলেছেন, তাপসী তো জমিরক্ষা আন্দোলনের শহিদ। তাঁর স্মরণ অনুষ্ঠানে সেই আন্দোলনের কথা কই? শহিদ স্মরণের নামে এ তো শহিদের প্রতি অপমান, তাপসী-রাজকুমারের সংগ্রামী স্মৃতির প্রতি অমর্যাদা। সিঙ্গুরের মানুষের দীর্ঘ সংগ্রামী ঐতিহ্যের অসম্মান। এ কি আপামর সাধারণ মানুষ, যাঁরা এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন, নানা ভাবে সহায়তা করেছেন, মিছিলে হেঁটেছেন, দিনের পর দিন বনধ পালন করেছেন, তাঁদের প্রতিও অসম্মান নয়? সেদিন মৃত তাপসীর চরিত্র হননে ব্যর্থ হয়ে সিপিএম নেতারা যে সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছিলেন, তাপসীর স্মরণ দিবসে শোকপালনের নামে ভুরি ভোজনের আয়োজন করে সেই একই হীন সংস্কৃতির পরিচয় দিলেন তৃণমূল নেতারা। আসলে দল আলাদা হলেও কালচার সেই একই। শহিদ স্মরণের নামে তৃণমূল নেতৃত্বের এ জাতীয় আচরণ অবশ্য নতুন নয়। নির্বাচনে জয়ের পর ২১ জুলাইয়ের শহিদদের স্মরণে তাঁরা ব্রিগেডে যে সভা করেছিলেন সেখানেও শোক ও শ্রদ্ধার চিহ্নমাত্র ছিল না, ছিল চিত্রতারকাদের নিয়ে রুচিহীন হুল্লোড়।

শহিদ রাজকুমার ভুলের প্রতিও কি তাঁরা যথাযথ আচরণ করেছিলেন? ২০০৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর সিঙ্গুর বিডিও অফিসে অনিচ্ছুক চাষিরা যখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন তখন সিপিএম সরকারের প্রশাসন মাঝরাতে হঠাৎ সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে পুলিশ-র‍্যাফ-কমব্যাট বাহিনীকে দিয়ে বীভৎস অত্যাচার চালায়। ৮৫ বছরের বৃদ্ধা থেকে আড়াই বছরের শিশু, রেহাই পায়নি কেউ। গোপালনগরের মাঝেরপাড়ার যুবক রাজকুমার ভুলকে মাটিতে ফেলে ব্যাপক লাঠিপেটা করেছিল পুলিশ। ডাক্তারের কাছে পর্যন্ত যেতে দেয়নি তাঁকে। পরদিন দুপুরে সম্পূর্ণ বিনা চিকিৎসায় মারা যান রাজকুমার। ৪৫ কিমি দূরের শেওড়াফুলি থেকে এক চিকিৎসককে তুলে এনে ডেথ সার্টিফিকেট লিখিয়ে পুলিশি ঘেরাটোপে তাঁর দেহ দাহ করে দেওয়া হয়। রাজকুমার সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রথম শহিদ। কিন্তু তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা রাজকুমারকে শহিদ বলে স্বীকার করতে চাননি। এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মীরাই সিঙ্গুরের গ্রামে গ্রামে শোকবেদি স্থাপন করেন। দলের আহ্বানে ঘরে ঘরে মা-বোনেরা মালা গেঁথে চোখের জলে তা অর্পণ করেন শহিদবেদিতে। এস ইউ সি আই (সি)-র প্রস্তাব মেনে কৃষিজমি রক্ষা কমিটি ২৭ সেপ্টেম্বর সিঙ্গুর বনধ পালন করে। ৩ অক্টোবর ঘরে ঘরে অরন্ধন এবং ৫ অক্টোবর জেলা জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। গরিব মানুষের প্রতি, জমিহারা কৃষকদের প্রতি যথার্থ দরদবোধ থাকলে তৃণমূল নেতৃত্ব রাজকুমারের প্রতি এ অসম্মান করতে পারতেন কি?

সকলেই জানেন, নন্দীগ্রামের মতো সিঙ্গুরেও এস ইউ সি আই (সি)-ই জমিরক্ষার আন্দোলন প্রথম শুরু করেছিল। জনগণকে সংগঠিত করে দাবি আদায়ের দৃঢ়তা নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলা তৃণমূলের রাজনীতিই নয়। সিঙ্গুরে তৃণমূলের শক্তি বেশি, তাই এস ইউ সি আই (সি) চেয়েছে তারা আসুক, না হলে সিঙ্গুরের আন্দোলনের খবর মিডিয়া দেবে না, রাজ্যের মানুষ জানবে না, আন্দোলন শক্তি পাবে না, সরকারি পুলিশি আক্রমণ একা এস ইউ সি আই (সি) প্রতিরোধ করতে পারবে না। পরে তৃণমূল নেতৃত্ব যখন বুঝলেন, চাষিরা তাঁদের উর্বর কৃষিজমি টাটার জন্য দিতে রাজি নন, তাঁরা যে কোনও মূল্যে সরকারি জবরদস্তি রুখতে প্রস্তুত, তখনই তাঁরা আন্দোলনে সামিল হলেন। এস ইউ সি আই (সি)-ই প্রস্তাব দেয়, দলীয় কমিটি নয়, আন্দোলনে সমস্ত স্তরের মানুষের অংশগ্রহণের জন্য চাই গণকমিটি। গড়ে ওঠে সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি।

আন্দোলনের পথ নিয়ে তৃণমূলের সাথে এস ইউ সি আই (সি)-র মতপার্থক্য ছিলই। এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা গ্রামে গ্রামে চাষিদের সংগঠিত করে মহিলা কমিটি, ছাত্র কমিটি, পাড়া কমিটি গড়ে তুলছিল। এস ইউ সি আই (সি) চেয়েছিল, সরকার জোর করে জমির দখল নিতে এলে এই সংগঠিত মানুষগুলিই তা রুখবে। তেমন করেই এলাকার মানুষের মানসিক প্রস্তুতিও গড়ে তুলছিল। ২ ডিসেম্বর যখন বিপুল সংখ্যক পুলিশ-র‍্যাফ নিয়ে সিপিএম সরকারের প্রশাসন জমির দখল নিতে এল তখন এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মীরা এলাকার মানুষকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় কর্মীরা এই প্রতিরোধে সামিল হলেও তাঁদের নেতারা সামিল হলেন না। প্রশাসন নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে প্রতিরোধ ভেঙে দিল। পুলিশি অত্যাচারে বহু এস ইউ সি আই (সি) কর্মী, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে চাষিরা আহত হলেন, গ্রেপ্তার হলেন। প্রতিবাদে ৫ ডিসেম্বর রাজ্যে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হল। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিলেন। এইভাবে আন্দোলন যখন একটা ব্যাপকতর রূপ নিচ্ছিল, সাধারণ ধর্মঘটের পর এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমে তা জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়ছিল, সে সময় আচমকা তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী কলকাতায় অনশনে বসার সিদ্ধান্ত নিলেন। রাজ্য তথা দেশের মানুষের দৃষ্টি সিঙ্গুরের পরিবর্তে কলকাতায় অনশনস্থলে চলে গেল। আন্দোলনের পরিবেশ অন্যরকম হয়ে গেল। তৃণমূল নেতারা সিঙ্গুরের চাষিদের বোঝালেন, আন্দোলনের আর দরকার নেই, নেত্রীর অনশনের মধ্য দিয়েই দাবি আদায় হয়ে যাবে। এরই সুযোগ নিল সিপিএম সরকার। পুলিশ দিয়ে প্রাচীর তুলে জমির দখল নিয়ে নিল। অথচ সেদিন তৃণমূল নেতৃত্ব যদি আন্দোলনটা এভাবে সরিয়ে নিয়ে না যেতেন, যদি সিঙ্গুরেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা হত, তবে নন্দীগ্রামের মতো সিঙ্গুরেও সরকার জমির দখল নিতে পারত না। এ প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (সি) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২০০৭ সালের ৪ জানুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, এই অনশনের দ্বারা একজন ব্যক্তি প্রচার পেতে পারেন, ভোটের রাজনীতিতে তাঁর সুবিধা হতে পারে, কিন্তু গণআন্দোলন এতে শক্তিশালী হয় না। তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীরা এটা চাননি। তাঁরা আন্দোলনটাই চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল এঁরা কি আন্দোলনের লোক? এঁরা তো সবাই পুঁজিপতি শ্রেণির কাছে দায়বদ্ধ। এঁদের অভিপ্রায় ছিল মূল দাবিটিকে গুলিয়ে দেওয়া এবং সেটাই ঘটল। তাঁরা মূল দাবি থেকে সরে এল। মূল দাবি ছিল, শিল্পের নামে কৃষিজমি নেওয়া চলবে না। দাবি শিফট হয়ে চলে এল, 'যাঁরা অনিচ্ছুক তাঁদের জমি নেওয়া চলবে না'।

তারপরও সাত বছর কেটে গেছে। তাপসী মালিক, রাজকুমার ভুলের আত্মদান, সিঙ্গুরের মানুষের অনমনীয় লড়াইয়ের মনোভাব, নন্দীগ্রামের মানুষের আপসহীন লড়াই এবং আন্দোলনে বাংলার মানুষের নিরঙ্কুশ সমর্থনে বাংলার ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল সরকার। স্বাভাবিকভাবেই সিঙ্গুরের মানুষের সাথে রাজ্যের মানুষের আশা ছিল, আন্দোলনের ময়দানে জমি ফিরিয়ে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব সরকারে এসে তা পালন করবেন। কিন্তু তাঁরা তা করলেন না। তাঁরা আইনের পথে গেলেন। অথচ মানুষ অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আইন সাধারণ মানুষ নয়, পুঁজিপতিদের পক্ষেই কাজ করে। তৃণমূল নেতৃত্বের উচিত ছিল সরকারে আসার সাথে সাথেই চাষিদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া। ২০১১ সালেরই ৫ আগস্ট রানি রাসমণি রোডের প্রকাশ্য জনসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেছিলেন, এখন তো সরকারে আছে তৃণমূল। গোটা হুগলি জেলার কৃষক ও গরিব মানুষকে সংঘবদ্ধ করে প্রাচীর ভেঙে টাটার জমি দখল করা হোক। বলেছিলেন, পূর্বতন সিপিএম সরকার জমি দখল করেছে ব্রিটিশ আমলের একটি ঔপনিবেশিক মধ্যযুগীয় আইনে, যে আইন পরিবর্তনের জন্য এখন পার্লামেন্টে আলোচনা করতে হচ্ছে কৃষক আন্দোলনের চাপে। তা হলে কেন গণআন্দোলনের জোয়ার তুলে জমি দখল করার পথে গেল না ওরা? পুলিশ-প্রশাসন তো ওদের হাতে। তিনি বলেন, এই আন্দোলন তো ন্যায়সঙ্গত হত। গায়ের জোরে সিপিএম সরকার টাটার স্বার্থে চাষির জমি কেড়ে নিচ্ছে। সেই জমি পুনরুদ্ধার করা কি অপরাধ!

এই ভাবে তৃণমূল নেতৃত্ব ভাবতে পারলেন না কেন? তৃণমূল সরকার কেন সেই জমি দখল করে চাষিদের হাতে ফিরিয়ে দিল না? কমরেড প্রভাস ঘোষ ঐ বক্তৃতাতেই বলেছিলেন, "আজ তৃণমূল সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। আমরা বিরোধী পক্ষ। এ কথা আমরা আগেও বলেছি যে, সরকার পরিবর্তন মানে রাষ্ট্রের পরিবর্তন নয়, ব্যবস্থার পরিবর্তন নয়। মালিক-শ্রমিক থাকবে, শোষণ-লুণ্ঠন থাকবে, এই ব্যবস্থার মধ্যে সরকার হচ্ছে পলিটিক্যাল ম্যানেজার মাত্র। এ ছাড়া কিছু না। ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউস যেমন কোম্পানির ম্যানেজার রাখে, বিজনেস ম্যানেজার রাখে, তেমনি সরকারটা হচ্ছে শাসকশ্রেণির পলিটিক্যাল ম্যানেজার। আমরাও যদি সরকারে একা যেতাম, আমরা কী করতাম? যে কথা অতীতে যুক্তফ্রন্টের সময় বলেছিলাম, লেনিন যেটা বলেছেন, তা হল, কমিউনিস্টদের লক্ষ্য থাকবে, ব্যবস্থার পরিবর্তন পার্লামেন্টের দ্বারা হয় না, অ্যাসেম্বলির দ্বারা হয় না, ভোটের দ্বারা হয় না— এটা জনগণকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো। আমরা শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন গড়ে তুলতাম এবং সেই আন্দোলনে পুলিশি আক্রমণ ঘটতে দিতাম না। আমলাতন্ত্র এবং পুলিশ-প্রশাসন, যেটা জনগণের উপর অত্যাচারের একটা হাতিয়ার, আমরা তার ক্ষমতা সংকুচিত করতাম। এর শক্তি কমিয়ে গণআন্দোলনের শক্তি, জনগণের লড়াইয়ের শক্তি, শ্রমিক-কৃষকের ঐক্যবদ্ধ শক্তি আমরা বাড়াতাম। তা করতে গেলে কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই হত। কেন্দ্রীয় সরকার হয়ত রাজ্য সরকার ভেঙে দিত। দেশের মানুষকে দেখাতাম একটা সরকার যখন জনগণের স্বার্থে কাজ করছে, গণতন্ত্র এবং গণআন্দোলনের স্বার্থে কাজ করছে, সেখানে বুর্জোয়া রাষ্ট্র সেই সরকারকে ভাঙছে এবং তখন এই নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতাম। কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রদর্শিত এই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি ষাটের দশকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সিপিএম মানেনি, সিপিআই মানেনি। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানলে তাদের বিপদ— সরকারে থাকা যায় না। তৃণমূল সরকারও মুখে যতই জনস্বার্থের কথা, চাষির স্বার্থের কথা বলুক, সরকারে গিয়ে তারা বুর্জোয়া স্বার্থই রক্ষা করে চলছে। তাই জমি ফিরিয়ে দিয়ে তারা টাটা সহ পুঁজিপতি শ্রেণির বিরাগভাজন হতে চায়নি। সরকারে গিয়ে ভোল পাল্টে আজ তারা সর্বত্র আন্দোলনের বিরোধিতার কথাই বলছে। এর দ্বারা তৃণমূল কংগ্রেস তার শ্রেণিচরিত্রকেই নগ্ন করে দিয়েছে। আসলে এই তাঁদের স্বরূপ। তাঁদের লক্ষ্য ছিল মানুষের বিক্ষোভকে পুঁজি করে রাজ্যে গদির দখল নেওয়া। সে লক্ষ্য হাসিল হয়েছে। তাই অনিচ্ছুক চাষি পরিবারের শ্যামলী দাস, রেবতী মান্না, মহানন্দ খাঁড়াদের দীর্ঘশ্বাস তাঁদের মনে কোনও আলোড়ন সৃষ্টি করে না। তাই জমি দখলের পথে না গিয়ে তাঁরা আইনি জটিলতার পথে গেলেন, যাতে সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙে। চাষিদের দেখালেন, তাঁরা উদ্যোগ নিয়েছেন, আবার পুঁজিপতিদেরও চটালেন না। এই যাঁদের শ্রেণিচরিত্র তাঁরা কখনও তাপসী-রাজকুমারদের যথার্থ মর্যাদা দিতে পারে না। তাপসী, রাজকুমারের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন হতে পারে একমাত্র চাষিদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার আন্দোলনকে জোরদার করার মধ্য দিয়েই। তৃণমূল কংগ্রেস আজ আর তা করতে পারে না।

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে, গণআন্দোলনকে সি পি এম-এর ফ্যাসিস্টসুলভ বর্বর অত্যাচার থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনেই নির্বাচনে সি পি এমকে পরাস্ত করার আহ্বান জানিয়েছিল এস ইউ সি আই (সি) এবং একমাত্র এই লক্ষ্যেই তৃণমূলকে সমর্থন করেছিল। ঐ দলের শ্রেণি চরিত্র সম্পর্কে কোনও বিভ্রান্তি বা সরকারে বসে তৃণমূল কী ভূমিকা নেবে, তা নিয়ে কোনও মিথ্যা আশা এস ইউ সি আই (সি)-র ছিল না। ১৯৭৭ সালে সি পি এম সরকারে বসার পর তার সকল জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে একমাত্র এই দলই মার খেয়ে অত্যাচার সহ্য করে একের পর এক গণআন্দোলন গড়ে তুলেছে, প্রকৃত সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডা ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছে, আজও একমাত্র এস ইউ সি আই (সি)-ই রাস্তাতেই আছে, গণআন্দোলনের ময়দানেই আছে। কর্মীরা আজও পুলিশের মার খেয়ে, জেলে গিয়ে জনস্বার্থে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। সিঙ্গুরের জমিহারাদের পাশেও তাঁরা আছেন আগের মতোই। শহিদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এটিই যথার্থ পথ।

চাই সংগ্রামী যৌবন

একের পাতার পর

সারা দেশ জানল ৬ জন নরপশুর চরম অত্যাচারের পরেও যে মেয়ে জীবন থেকে পালাতে চায়নি, সেই 'দামিনী' আর নেই। তার মৃত্যুতে যখন ব্যথায় স্তব্ধ সারা দেশ, সেই গভীর ব্যথার সময়ে এসেছিল আহ্বান— 'শোককে শক্তিতে, ঘৃণার আগুনকে অদম্য সংগ্রামে পরিণত করুন'। এ আহ্বান রেখেছিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। আহ্বান ছিল, ঘরে ঘরে অঙ্গীকার গ্রহণ করুন, নারী নির্যাতন রুখতে অক্ষম সরকার-পুলিশ-প্রশাসনের মুখ চেয়ে অসহায় হয়ে থাকব না। গড়ে তুলব সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ। স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার, ক্লাব-লাইব্রেরি, মহল্লায় মহল্লায় অসংখ্য মানুষ স্বাক্ষর করলেন অঙ্গীকারপত্রে। গড়ে উঠল এক নতুন সামাজিক আন্দোলন। বহু স্থানে গড়ে উঠল নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটি।

পরাধীন ভারতে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় চিন্তায় আচ্ছন্ন সমাজে নারীর উপর সীমাহীন অত্যাচার দেখে মহান মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে বলেছিলেন, "নারী লইয়া পুরুষের এই যে পুতুল-খেলা, এই যে স্বার্থপরতা, পাশববৃত্তির এই যে একান্ত উন্মত্ততা, সে শুধু নারী জাতিকেই অপমানিত ও অকর্মিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, পুরুষ, ...সমাজকে এবং সমস্ত মাতৃভূমিকে ঐ সঙ্গে টানিয়া নামাইয়া আনিয়াছে।" সে দিনের থেকে আজ এত বছর পেরিয়েও কেন নারী নির্যাতন প্রতিদিনের ঘটনায় পর্যবসিত? এর সঙ্গে যুক্ত আছে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থের সম্পর্ক। তার জন্যই সমাজে আমদানি করা হয়েছে ভোগবাদী চিন্তা, সংস্কৃতি — যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দুনিয়ার সবকিছুই বিবেচিত হয় পণ্য হিসাবে। নারীদেহও সেই নিরিখে একটি পণ্য। বিজ্ঞাপন, মডেলিং, ফ্যাশন শো, সিনেমার দৃশ্য, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার র‍্যাম্পে হাঁটা, এমন অসংখ্য পথে নারীকে পণ্য হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। যার ফলে সমাজে একটা ধারণা গেড়ে বসছে যে, নারীকে যে কোনও ভাবে ভোগ করা যায়। মানুষের সমাজে ন্যায়নীতি বোধ, ভালো-মন্দের ধারণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে না গিয়ে পুঁজিবাদী সমাজ এই ন্যায়নীতি, উচিত-অনুচিতের ধারণাকেই এখন ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্বলতা এবং সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের যুগবৈশিষ্ট্যের কারণে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অগ্রগতির যুগের মানবতাবাদী মূল্যবোধ সমাজে সম্পূর্ণভাবে স্থান করে নিতে পারেনি। পুরনো ধর্মীয় মূল্যবোধ এখন অচল, অথচ বুর্জোয়া সমাজ নতুন উন্নত মূল্যবোধ দিতে ব্যর্থ। ফলে নারীকে সম্মানের চোখে দেখার যতটুকু রীতি সমাজে ছিল তা-ও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে বসেছে।

এই অবক্ষয়ের হাত ধরে এসেছে পর্নোগ্রাফি এবং মদের ঢালাও প্রসার। যে দল যেখানে সরকার চালাচ্ছে তারা সেখানেই এতে মদত দিয়ে চলেছে। সংবাদমাধ্যম এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। পর্নোগ্রাফির এক বিশাল বাজারে খাটছে কোটি কোটি ডলার। এমনকী ভিডিও গেমেও জায়গা করে নিয়েছে ধর্ষণের মতো বিষয়। ইন্টারনেট মারফত তা ছড়িয়ে যাচ্ছে ঘরে ঘরে। মেয়েদের দেখলেই পাশবিক লালসার তাড়নায় ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রবৃত্তি তৈরি হচ্ছে বহু যুবকের মধ্যে। মদের অবাধ প্রসারের ফলে এ প্রবণতা আরও বাড়ছে। টিভিতে, সংবাদমাধ্যমে, সিনেমায়, ভিডিও গেমসে পরিকল্পিতভাবে হিংসাত্মক হানাহানির প্রসার দেখানো চলছে। এগুলি কিশোর যুবকদের প্ররোচিত করছে অন্যকে যন্ত্রণা দেওয়ার দৃশ্য উপভোগ করায়। একদল নিজেদের অপ্রাপ্তি থেকে সৃষ্ট হীনমন্যতাকে ঢাকতে সহজ শিকার মেয়েদের যন্ত্রণা দিয়ে আনন্দ পাচ্ছে। আবার সমাজে প্রতিষ্ঠিত একদল লোক নিজেদের প্রতিপত্তির জোরে ভোগ লালসা চরিতার্থ করছে অসহায় বা কর্মক্ষেত্রে তাদের উপর নির্ভরশীল নারীর উপর। দেশে প্রতিদিন বাড়ছে নারীর উপর চরম নির্যাতন, লাঞ্ছনা, ধর্ষণ। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী শুধু ২০১২ সালে দেশে ৩৩ হাজার ৪৬৪ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে দুই থেকে পাঁচ বছরের দুধের শিশুর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। পুলিশের কাছে নথিভুক্ত না হওয়া ঘটনার সংখ্যা আরও কয়েক গুণ বেশি। ঘরের অভ্যন্তরেও লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা হচ্ছে অসংখ্য মেয়ে।

দিল্লির ঘটনায় ব্যাপক আন্দোলন হওয়ার ফলে সরকার বাধ্য হয়েছিল বিচারপতি জে এস ভার্মার নেতৃত্বে একটি কমিশন করতে। সরকার এই কমিশনের সুপারিশ মেনে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনে কিছু পরিবর্তন আনলেও সরকারি মন্ত্রী, নেতা, আমলা, পুলিশ এবং বিচার বিভাগের উচ্চপদাধিকারীদের মধ্যে মহিলাদের প্রতি সঠিক মর্যাদাসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং তার অন্যথা ঘটলে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করেনি। পুলিশ আগের মতোই প্রভাবশালী মহলের বিরুদ্ধে মহিলাদের অভিযোগ নিতে অনিচ্ছুক। তাই সিবিআই-এর ডিরেক্টর নির্বিকার চিত্তে ধর্ষণ নিয়ে রসিকতা করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি পুত্র তথা কংগ্রেস সাংসদ দিল্লির আন্দোলনরত ছাত্রীদের রংচং মাখা মেয়ে বলতে পারেন, নরেন্দ্র মোদী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মহিলাকে ৫০ কোটি টাকার গার্ল ফ্রেন্ড বলেন প্রকাশ্য সভায়। সিপিএম নেতারা তাঁদের বিরোধী মহিলাদের সম্পর্কে কী ধরনের কটূক্তি করেছেন তা এ রাজ্যের মানুষ ভালোই জানেন। পার্ক স্ট্রিটের ধর্ষিতা মহিলা সম্পর্কে কদর্য উক্তি করতে তৃণমূলের মহিলা এম পি-রও বাধে না। এই কদর্য বুর্জোয়া রাজনীতি যে নারী নির্যাতন রুখতে পারে না, তা পরিষ্কার। এস ইউ সি আই (সি) ভার্মা কমিশনের কাছে সুপারিশ করেছিল, বিশিষ্ট নাগরিক, মহিলা সংগঠন, বিভিন্ন গণসংগঠন, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি সহ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন নাগরিক কমিটি স্তরে স্তরে গড়ে তোলা এবং তাদের মাধ্যমে নারী নির্যাতন রুখতে করণীয় বিষয়ে প্রশাসনের উপর নজরদারি চালানোর। কিন্তু সরকার তা করেনি। যে পশ্চিমবঙ্গ একদিন প্রতি-বাদের পথ দেখাত দেশকে, সেই বাংলার পরিস্থিতিও ভয়াবহ। ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর হিসাবে সারা দেশে নারীদের উপর আক্রমণ, লাঞ্ছনা, ধর্ষণের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে দেশের শীর্ষ স্থানে। এ রাজ্যের বর্তমান শাসকদল তৃণমূলের নেতারা পূর্বতন শাসক সিপিএমের মতোই নির্লজ্জভাবে এ তথ্য অস্বীকার করে বলে চলেছেন, এ রাজ্যে পুলিশের খাতায় অপরাধ বেশি নথিভুক্ত হয় বলেই সংখ্যাটা বেশি মনে হচ্ছে। যদিও প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় মানুষ জানে বাস্তবটা কী।

১৬ ডিসেম্বর, বাঙ্গালোর

এ যুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, একটা জাতি, একটা দেশের জনগণ অভুক্ত, অর্ধভুক্ত থেকেও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, হাজার অত্যাচার ও নিপীড়ন সত্ত্বেও অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়ে, যদি তার সঠিক আদর্শ ও উন্নত নৈতিক বল থাকে। তাই ধুরন্ধর শাসকরা দেশের যুব সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চায়। তাই তারা যুব সমাজকে এ দেশের বুকে গড়ে ওঠা রেনেশাঁস ও স্বদেশি আন্দোলনের যুগের মনীষী ও বিপ্লবীদের উন্নত নৈতিক মান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছিন্নমূল করে দিতে চাইছে। কুৎসিত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, ভোগসর্বস্বতা, নেশা, জুয়া, অশ্লীল নাচ-গান, ব্লু-ফিল্ম ও নোংরা যৌনতার স্রোতে তাদের ডুবিয়ে দিতে চাইছে। শোষণ যন্ত্রণার অবসান চেয়ে জনগণ যাতে বিপ্লবের পথে না যায় তার জন্য পুঁজিবাদের আজ এটা প্রয়োজন। এই ধর্ষকরা মাতৃগর্ভ থেকে ধর্ষণকারী হয়ে জন্মায়নি। মানবতার শত্রু বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের বিষাক্ত আঁতুড়েই এই ধর্ষকরা জন্মাচ্ছে। এই সমাজ যতদিন টিকে থাকবে, প্রতিদিন এমন অসুস্থ মানসিকতার জন্ম দিয়ে চলবে।

অনেক বুদ্ধিজীবী প্রচার করেন, আদিম প্রবৃত্তির অন্ধ তাড়না থেকে মানুষের মুক্তি নেই। কিন্তু মহান নেতা লেনিন ও স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সমাজ অবসান ঘটিয়েছিল যৌন অপরাধের, গণিকা বৃত্তির। নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষকে দাঁড় করিয়েছিল এক মহান মর্যাদার বেদিতে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের ফলে একমেরু বিশ্বে একচেটিয়া পুঁজির অবাধ দাপটের ফলে বিশ্ব জুড়েই বাড়ছে যৌন বিকৃতি, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন। এই কদর্যতার আঁধারে দিল্লির ছাত্র-যুব আন্দোলন জ্বালিয়েছে এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য একে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় পরিণত করতে চাই সঠিক নেতৃত্বে সুসংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী প্রচেষ্টা। দেশের মানুষ বড় আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে সেই সংগ্রামী যৌবনের দিকে।

দামিনীর মৃত্যু জ্বালিয়েছে প্রতিবাদের দীপশিখা

১৬ ডিসেম্বর রাজ্যে রাজ্যে প্রতিবাদ

দিল্লির ধর্ষিতা মেয়েটির নাম আমরা জানি না। কিন্তু তাঁর উপর পাশবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে তাঁর দুঃসাহসিক সংগ্রাম এবং এই সংগ্রামের পাশে সারা দেশের শুভ চেতনার সচেতন উত্থান সসম্মানে তাঁর নাম দিয়েছে 'দামিনী'। বস্তুত দামিনী নামটি দেশে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হিসাবে সমুচ্চারিত। গত বছর ১৬ ডিসেম্বর তাঁর উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছিল মানুষের অবয়বধারী বিকৃত মনের কিছু সমাজবিরোধী। ২৯ ডিসেম্বর ঘটে তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু।

এই দু'টি দিনকেই নারী নিরাপত্তা রক্ষার আন্দোলনে বিশেষ স্মরণীয় দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও, যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও এবং মহিলা সংগঠন এ আই এম এস এস। সংগঠনগুলির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আহ্বানে ১৬ ডিসেম্বর রাজ্যে রাজ্যে পালিত হয়েছে দামিনী স্মরণ কর্মসূচি।

এদিন হায়দরাবাদের গান্ধিভবনে আয়োজিত সভায় অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ কমিটির বিশিষ্ট সদস্য ডঃ গৌরীশঙ্কর গণমাধ্যমে অশ্লীলতা প্রসারকে নারীর নিরাপত্তাহীনতার অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন। বাঙ্গালোরের জনসভায় বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব এইচ জি সোমশেখর, বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক আল্লামা প্রভু বেট্টাদোর নারী-পুরুষের সম মর্যাদার কথা বলেন। চেন্নাইয়েও অনুষ্ঠিত হয় অনুরূপ কনভেনশন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের সঙ্গে উক্ত তিন সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এক জনাকীর্ণ কনভেনশনে আলোচনার পাশাপাশি ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। কনভেনশন সিদ্ধান্ত নেয় নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রতিরোধী সংগঠন গড়ে তোলা হবে।

গুজরাটে আমেদাবাদের সরদার বাগে এদিন দামিনীর স্মারকবেদি স্থাপন করে মাল্যদান করা হয়। নারীর উপর অত্যাচার সম্পর্কিত সঙ্গীত পরিবেশন ছাড়াও নারীরা কীভাবে আত্মরক্ষা করতে পারে তার কৌশল প্রদর্শিত হয়। নারীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত কথক নৃত্য এবং নারীর নিরাপত্তায় প্রশাসনের দায়সারা মনোভাব সম্পর্কিত একটি নাটক প্রদর্শিত হয়। বহু মানুষ এই কর্মসূচিতে সামিল হন। সন্ধ্যায় মোমবাতি মিছিল হয়। 'আমরা করব জয়' গানটি গাইতে গাইতে মিছিল এগিয়ে চলে। দাবি ওঠে, নারী নিরাপত্তা সংক্রান্ত ভার্মা কমিটির সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে, স্কুল সিলেবাসে মেয়েদের জুডো ও ক্যারাটে শিক্ষা দিতে হবে। রাজস্থানেও তিন সংগঠনের যুক্ত মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে মিছিল শেষে হয় পথসভা।

আসামের গুয়াহাটিতে সহস্রাধিক মানুষ উক্ত তিন সংগঠনের ডাকে মিছিলে সামিল হন। মিছিল শেষে এক সভায় আসামের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডাঃ হীরেন গোহাই, এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড চন্দ্রলেখা দাস সহ গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। হীরেন গোহাই বলেন, এই সমাবেশ দেখে আমি আশান্বিত। মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তির থেকে বড় শক্তি আর নেই। এই সংঘবদ্ধ শক্তিই নারী নির্যাতন-ধর্ষণ প্রতিরোধের উপায়। ত্রিপুরার আগরতলায় কর্নেল চৌমুহনি থেকে বটতলা পর্যন্ত মিছিল হয়।

কলকাতায় তিন সংগঠনের যুক্ত মিছিল হেদুয়া পার্ক থেকে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত আসে। পাশাপাশি এসপ্ল্যানেডে নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির উদ্যোগে গণঅবস্থানে বহু বিশিষ্ট মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মালদহের রথবাড়ি মোড়ে পাঁচ শতাধিক মানুষের মিছিল নারী নিরাপত্তায় সরকারি নিষ্ক্রিয়তাকে ধিক্কার জানায়। শিলিগুড়িতে পদযাত্রায় অধ্যাপিকা ডঃ শুক্লা পাল, নাট্যকার মলয় ঘোষ, অধ্যাপক অজিত রায়, অধ্যাপক প্রদীপ মণ্ডল, অধ্যাপক বিকাশ দেব প্রমুখ অংশ নেন এবং কোর্ট মোড়ে প্রতিবাদী অবস্থানে বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিজয় দলুই। শিলিগুড়ি কলেজের সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই পদযাত্রায় সামিল হন।

আগামি ২৯ ডিসেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুব-মহিলাদের জাতীয় কনভেনশন। ৩০ ডিসেম্বর পার্লামেন্ট অভিযানে সামিল হবেন অসংখ্য মানুষ। এই প্রতিবাদের দীপশিখা আজ সারা দেশেই মানুষের মধ্যে আশা জাগিয়েছে।

সামাজিক খাতে বরাদ্দ কমছে

সাংসদদের বেতন বাড়ছে ভারত, ব্রিটেনে

রোম শহর যখন আগুনে জ্বলছিল, রাজা নিরো নাকি তখন বেহালা বাজাচ্ছিলেন। কথাটা মনে পড়ে গেল ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের একটি ঘটনায়। মন্দার কবলে পড়ে গোটা ইউরোপের অর্থনীতির যখন বেহাল দশা এবং ব্রিটেনও যখন তার ব্যতিক্রম নয়, তখন সেখানকার পার্লামেন্ট তার এম পি-দের ১১ শতাংশ বেতন বাড়াতে চলেছে। ২০১৫-র মে মাস থেকে তাঁদের বার্ষিক বেতন বেড়ে দাঁড়াবে ১ লক্ষ ২০ হাজার ডলারেরও বেশি। অথচ মন্দার কারণে সরকারি সংস্থাগুলিতে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন হার ১ শতাংশের বেশি বাড়ানো যাবে না বলে আগেই ঘোষণা করেছিল ব্রিটিশ সরকার। শুধু তাই নয়, মন্দার দোহাই দিয়ে সরকার বহু সামাজিক প্রকল্পের বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে। ফলও হয়েছে মারাত্মক। দেশে অপুষ্টিতে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সরকারি পরিসংখ্যানেই দেখা যাচ্ছে, ইংল্যান্ডে ২০০৮-'০৯ থেকে ২০১২-'১৩ সালের মধ্যে অপুষ্টিজনিত রোগে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। মানসিক রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও সরকারি সাহায্যের পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় ২ শতাংশ কমে গেছে।

সাংসদদের বেতন বৃদ্ধির এই ঘোষণায় ভীষণ ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, মন্দার দোহাই দিয়ে সরকারি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির হারের ঊর্ধ্বসীমা যখন ১ শতাংশে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তখন সাংসদদের বেতন ১১ শতাংশ বাড়ানো হবে কোন হিসাবে। সাংসদরা কি অন্য জগতের বাসিন্দা! বিভিন্ন সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে তাঁরা নিজের নিজের এলাকার সাংসদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়েছেন যাতে তাঁরা বর্ধিত বেতন গ্রহণ না করেন। তাঁরা আরও বলেছেন, বর্ধিত বেতন গ্রহণ করবেন যে সব সাংসদ, পরের নির্বাচনে তাঁদের কাউকে তাঁরা ভোট দেবেন না।

কয়েকজন সাংসদ এই বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে অনুচিত বলে মন্তব্য করলেও বেশিরভাগই জোর গলায় একে সমর্থন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন মুখে বলেছেন, মন্দার কারণে যখন ব্যয়সঙ্কোচ চলছে তখন সাধারণ মানুষের তুলনায় সাংসদদের বেশি বেতন নেওয়া ঠিক নয়। যদিও বর্ধিত বেতন নিজে না নেওয়ার কথা কিন্তু তিনি স্পষ্ট করে বলেননি।

ভারতের সাংসদদের সঙ্গে ব্রিটেনের সাংসদদের অদ্ভুত মিল লক্ষ করা যাচ্ছে। দু'দেশেই ক্ষমতার রাজনীতির কুশীলবদের লক্ষ্য একটাই — নিজেদের সুযোগ-সুবিধা যতটা পারা যায় বাড়িয়ে নেওয়া। দেশের অধিকাংশ লোক না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে থাক, অপুষ্টিতে ভুগে মরুক, তাঁদের কিছু যায় আসে না। যাদের তাঁরা প্রতিনিধি, সেই জনসাধারণকে তাঁদের দরকার পড়ে শুধু ভোটের সময়ে। তখন তাঁরা দামি জুতোয় কাদা মাখিয়ে জোড়হাতে গরিবের কুঁড়েঘরে যান। সামনে ফটোগ্রাফারদের রেখে ভাঙা খাটিয়ায় বসে রুটি চিবান। পরদিন সেইসব ছবি বড় বড় করে খবরের কাগজে ছাপা হয়। এরপর ভোটে জিতে একবার সংসদে পৌঁছতে পারলে আর গরিব সাধারণ মানুষের কথা মনেও পড়ে না তাঁদের।

শুধু ভারত বা ব্রিটেন নয়, সব দেশেই বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের চেহারা আজ এরকমই কুৎসিত, কদাকার। সর্বত্রই 'জনগণের জন্য, জনগণ কর্তৃক জনগণের সরকার' গড়ার বদলে সংসদীয় গণতন্ত্র 'লুঠেরাদের জন্য, লুঠেরা কর্তৃক লুঠেরাদের সরকার' তৈরি করে চলেছে এবং জনগণের রক্ত শুষে সমস্ত রকমের দুর্নীতির কালি গায়ে মেখে নেতা-মন্ত্রীরা নিজেদের ভারি পকেট আরও ভারি করার লক্ষ্যে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পচা-গলা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অঙ্গ এই সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিই হল এইসব দুর্নীতিবাজ লুঠেরাদের আঁতুড়ঘর। এই ব্যবস্থা যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন এর কালো থাবা থেকে নিস্তার নেই মানুষের। একমাত্র এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা যথার্থ বিপ্লবী দলই পারে পাল্টা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে। অনেকেরই হয়তো মনে আছে, ভারতে সংসদে দাঁড়িয়ে বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদ করেছিলেন ৫৪৫ সাংসদের মধ্যে মাত্র একজন। তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলের ডাঃ তরুণ মণ্ডল। কেন তিনি একা? কারণ তিনিই একমাত্র সংসদে একটি প্রকৃত বিপ্লবী রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করেন। বাকিদের দলের ঝান্ডার রঙ যাই হোক, সকলেই আসলে একটিমাত্র শ্রেণি, অর্থাৎ শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি, জনসাধারণের নয়।

ভদোদরা

ম্যাক্সিম গোর্কির চোখে লেনিন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কম্পাসের কাঁটার মতো তাঁর চিন্তা সব সময়েই ঘুরে দাঁড়াত মেহনতি মানুষের শ্রেণি স্বার্থের দিকে। লন্ডনে একদিন সন্ধ্যায় আমাদের কয়েকজনের বিশেষ কোনও কাজ ছিল না। আমরা গেলাম একটা গান-বাজনার থিয়েটারে, একটা জনপ্রিয় ছোট থিয়েটার, সেখানে যায় সাধারণ লোকেরাই। সেখানে ভ্লাদিমির ইলিচ ক্লাউনদের দেখে আর মজার দৃশ্যগুলোর সময়ে মন খুলে হাসলেন। অন্যান্য দৃশ্যের সময় তেমন কোনও আগ্রহ দেখালেন না। কিন্তু ব্রিটিশ কলম্বিয়ার দু'জন কাঠুরিয়ার একটা গাছ কাটার দৃশ্যটা দেখলেন মনোযোগ দিয়ে। কাঠুরিয়াদের শিবিরের মতো করে ছোট নাট্যমঞ্চটিকে সাজানো হয়েছিল; সেখানে এক গজের বেশি মোটা গাছের গুঁড়িটাকে দু'জনে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে কেটে ফেলল এক মিনিটের মধ্যে।

ভ্লাদিমির ইলিচ মন্তব্য করলেন, 'এটা তো নিশ্চয়ই দর্শকদের সুবিধের জন্যে। আসলে তো এত তাড়াতাড়ি কাজ হয় না। তবে, একটা জিনিস স্পষ্ট — ওখানে ব্যবহার করে কুড়ুল, তাতে অনেকটা খাসা কাঠ কুঁচো হয়ে নষ্ট হয়ে যায়, কোনও কাজে লাগে না। এই হল সংস্কৃতিবান ব্রিটিশ!' পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনে বিশৃঙ্খলার কথা তিনি বললেন, বললেন কী বিরাট পরিমাণ কাঁচামালের অপচয় হয়, এবং এ বিষয়ে বই লেখার কথা কেউ এখনও ভাবেনি বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

দু'বছর পরে কাপ্রিতে কাল্পনিক উপন্যাস নিয়ে আ. আ.বগ্‌দানভম্যানিভ্‌স্কির সঙ্গে আলোচনার সময়ে তিনি বলেছিলেন, 'সমস্ত তেল, লোহা, কাঠ আর কয়লার অপচয় করে পুঁজিবাদী লুটেরারা কীভাবে পৃথিবীটাকে ছারখার করছে। তাই নিয়ে শ্রমিকদের জন্যে একখানা উপন্যাস আপনার লেখা উচিত ছিল। বইখানা কাজের হত, শ্রীযুক্ত মাখপন্থী!'

• • •

ওয়েস্টকোটের বগলের ফাঁকে বুড়ো আঙুল দুটো ঢুকিয়ে তিনি নিজের চিরাচরিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপরে সেই ছোট্ট কামরাটায় আস্তে আস্তে পায়চারি করতে থাকলেন। তখন কোঁচকানো চোখের পাতার ভিতর দিয়ে তাঁর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল।

'যুদ্ধ আসছে। এটা অনিবার্য। পুঁজিবাদী দুনিয়াটা পচে-গলে গেঁজে উঠেছে, লোকে শোভিনিজম আর জাতীয়তাবাদের বিষ গিলতে আরম্ভ করেছে। আমার মনে হয় একটা ইউরোপ-জোড়া যুদ্ধই আসছে। প্রলেতারিয়েত? রক্তস্নান রোধ করবার শক্তি প্রলেতারিয়েতের হবে বলে মনে করতে পারছি না। কী করে সম্ভব? সারা ইউরোপ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘট? শ্রমিকরা সে জন্যেও যথেষ্ট সংগঠিত নয়, যথেষ্ট শ্রেণিসচেতনও নয়। এমন ধর্মঘট হবে গৃহযুদ্ধের সূচনা, কিন্তু বাস্তববাদী রাজনীতিক হিসেবে আমরা তেমন কিছুর উপর নির্ভর করতে পারি না।'

উনি আমার কাছে এগিয়ে এলেন। বিস্ময়ের সুরে, জোর দিয়ে কিন্তু শান্তভাবে বললেন, 'ভাবুন তো একবার ব্যাপারটা! ভুরিভোজে পরিতৃপ্ত যারা তারা খেতে না পাওয়া মানুষগুলোকে কাটাকাটির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে কীসের জন্যে — ভাবুন একবার! ভাবতে পারেন, এর চেয়ে নির্বোধ, এর চেয়ে জঘন্য পাপাচার আর কিছু হতে পারে? এর জন্যে শ্রমিককে ভয়াবহ মূল্য দিতে হবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত জয়ী হবে শ্রমিক; সেটাই ইতিহাসের নির্দেশ।'

ইতিহাসের কথা তিনি বলতেন প্রায়ই, কিন্তু ইতিহাসের নির্দেশ আর ক্ষমতা নিয়তির মতো মাথা পেতে মেনে নেবার কোনও কথা তাঁর মুখে শুনিনি কখনও।

ভ্লাদিমির ইলিচের মতো এমন অপরকে হাসিয়ে হাসতে দেখিনি আর কাউকে। এটা অদ্ভুত ব্যাপার। ভীষণ বাস্তববাদী এই মানুষটি, যিনি মর্মান্তিক সামাজিক বিপর্যয়ের অনিবার্যতা দেখতে পাচ্ছিলেন, অনুভব করছিলেন অমন সুতীব্র ভাবে, যিনি পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রতি ঘৃণায় অনমনীয় অবিচল, তিনি কেমন করে অমন অকপটে হাসতে পারেন, কেমন করে হাসতে হাসতে তাঁর চোখে জল এসে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে! কী সতেজ বলিষ্ঠ মন হলে তবে কেউ অমন করে হাসতে পারে। হাসির দমকের উপরই তিনি বললেন, 'আপনি হাস্যরসের সাহিত্যিক — তাই না? এ যে ভাবাই যায় না। কী দারুণ মজার ব্যাপার...।'

চোখ মুছে, শান্তভাবে মৃদু হেসে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'নিজের বিপদ-আপদের মজার দিকটা আপনি দেখতে পান, এটা ভালো। কৌতুক জ্ঞানটা চমৎকার গুণ। কৌতুক আমি গ্রহণ করতে পারি, যদিও কৌতুক করবার ক্ষমতা আমার নেই। জীবনে যত দুঃখ আছে, কৌতুকও আছে বোধহয় ততই, কম নয়, তাতে আমি নিশ্চিত।'

• • •

কাপ্রিতে জেলেদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন, জানতে চাইতেন তাদের আয় কত, তাদের উপর পাদ্রি-পুরুতদের প্রভাব কতখানি, কী রকমের ইস্কুলে তারা ছেলেমেয়েদের পাঠায়। তাঁর আগ্রহের পরিধি দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একজন পাদ্রি আছে এক গরিব কৃষকের ছেলে, কথাটা শুনে অমনি সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানতে চাইলেন ঃ কৃষকরা কি ঘনঘনই ধর্মীয় ইস্কুলে ছেলেদের পাঠায়, আর তারা কি নিজেদের গ্রামেই পাদ্রির কাজ করতে আসে?

'দেখছেন না ব্যাপারটা? ওটা যদি নিছক আকস্মিক ঘটনা না হয়, তা হলে নিশ্চয়ই ভ্যাটিকানের পলিসি ... অতি ধূর্ত পলিসি বটে!'

আমি কল্পনাই করতে পারি না, আর কেউ সবার উপরে এতখানি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন, আবার উচ্চাভিলাষী হবার প্রলোভনও জয় করতে পারেন। আর, সাধারণ মানুষের প্রতি এমন প্রাণবন্ত আগ্রহ বজায় রাখতে পারেন।

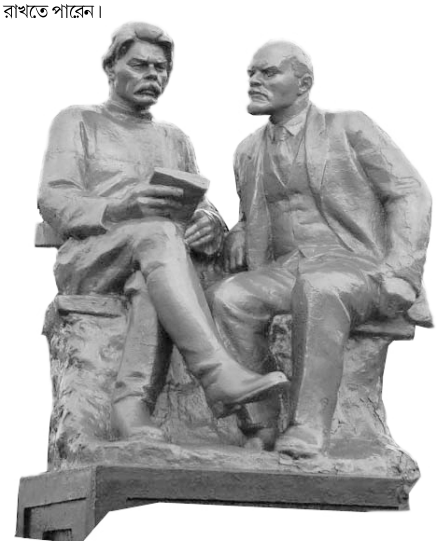

তাঁর একটা আকর্ষক গুণ ছিল, সেটা দিয়ে তিনি মেহনতি মানুষের অন্তর আর সহানুভূতি জয় করে নিতেন। তিনি ইতালীয় ভাষায় কথা বলতে পারতেন না, কিন্তু কাপ্রির যেসব জেলে শালিয়ানপিন এবং আরও বেশ কিছু বিশিষ্ট রুশীকে দেখেছে, তারা আপনা থেকেই এই মানুষটিকে একটা বিশেষ আসনে বসিয়ে দিয়েছিল। তাঁর হাসিটা প্রবল প্রভাব বিস্তার করে মানুষকে বশ করে ফেলত। সে হাসি হল— যিনি মানুষের মূঢ়তা বুঝতে পারেন, বুদ্ধিমত্তার ধূর্ত লম্ফঝম্ফ ধরতে পারেন, তেমনি 'সাধারণ মানুষে'র শিশুর মতো সরলতায়ও আনন্দ পেতে জানেন— এমনি মানুষের প্রাণখোলা হাসি। বৃদ্ধ মৎস্যজীবী গিওভান্নি স্পাদারো বলেছিলেন, 'সৎ না হলে কেউ অমন করে হাসতে পারে না।'

আকাশেরই মতো নীল আর স্বচ্ছ ঢেউয়ের উপর নৌকোয় বসে দুলতে দুলতে লেনিন 'আঙুলে', তার মানে, ছিপ ছাড়া শুধু সুতো-বঁড়শিতে মাছ ধরা শেখবার চেষ্টা করছিলেন। মৎস্যজীবীরা তাঁকে বলে দিয়েছিল, আঙুলে এতটুকু কম্পন বোধ করলেই টান মারতে হবে। তারা বলেছিল, 'কোজি, দ্রিন্-দ্রিন্। কাপিশি?' ঠিক তখনই তাঁর বঁড়শিতে একটা মাছ পড়ল এবং শিশুর মতো খুশির চিৎকার তুলে আর শিকারির উত্তেজনায় মেতে তিনি মাছটাকে টেনে তুললেন, 'আহা! দ্রিন্-দ্রিন্!' মৎস্যজীবীরাও শিশুর মতো হাসতে হাসতে হুল্লোড় তুলল। তারা ওঁর ডাক-নাম দিল সীনিয়োর দ্রিন্-দ্রিন্। লেনিন চলে যাবার অনেক পরেও তারা বারবার জানতে চাইত। 'সীনিয়োর দ্রিন্-দ্রিন্ কেমন আছেন? জার তাঁকে ধরতে পারবে না, ঠিক নিশ্চিত জানেন তো?'

• • •

১৯১৯-এর নিদারুণ ভুখা বছরটায় কমরেডরা এবং বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সৈনিক আর কৃষকেরা লেনিনকে যে খাবার পাঠাতেন সেগুলো খেতে তিনি লজ্জা পেতেন। তাঁর ফ্ল্যাটটা মোটেই আরামের ছিল না। সেখানে পার্সেলগুলি এলে তিনি ভ্রূকুটি করতেন, বিব্রত বোধ করতেন, তারপরে, যাঁরা অসুস্থ কিংবা পুষ্টির অভাবে দুর্বল তাঁদের মধ্যে ময়দা, চিনি আর মাখন ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিতেন। আমাকে তাঁর সঙ্গে খেতে ডেকে বললেন ঃ 'আস্ত্রাখান থেকে এসেছে কিছু ধূম-শুঁটকি মাছ, খাওয়াতে পারি আপনাকে।' সক্রেটিস-ধাঁচে ভূজোড়া কুঁচকে তেরচা প্রখর দৃষ্টি ফেলে তিনি আরও বললেন ঃ 'সবাই জিনিসপত্র পাঠিয়ে চলেছে, যেন আমি তাদের মালিক! কিন্তু এটা ঠেকাই বা কেমন করে? নিতে অস্বীকার করলে দুঃখিত হবে। অথচ, সর্বত্র সবাই-ই তো না -খেতে-পাওয়া।'

তাঁর কোনও বিশেষ চাহিদা ছিল না। মদ্যপান আর ধূমপান বিষয়টাই তাঁর জানা ছিল না। সকাল থেকে রাত অবধি ব্যস্ত থাকতেন কঠিন আর জটিল সব কাজে, নিজের প্রয়োজনের দিকে নজর দিতে তিনি একেবারেই জানতেন না। কিন্তু নিজের কমরেডদের জীবনযাত্রার উপর প্রখর নজর রাখতেন। একদিন ডেস্কে বসে কী যেন লিখছিলেন। 'এই যে, কেমন আছেন?' কাগজ থেকে কলম একটি বারও না তুলেই তিনি বললেন, 'এক মিনিটে শেষ করছি। একজন কমরেড একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে গেছেন, স্পষ্টতই তিনি ক্লান্ত। তাঁর মন ভালো করবার চেষ্টা করা দরকার। মানুষের মেজাজ দরকারি জিনিস।'

• • •

আমার পুরনো পরিচিত এক ভদ্রলোক, নাম প. আ.স্করোখোদভ, তিনিও আমারই মতো সরমভোর মানুষ। তিনি ছিলেন শান্ত মেজাজের মানুষ। চেকায় তাঁর কঠোর কাজের বিষয়ে তিনি একদিন আমার কাছে আক্ষেপ করছিলেন। তাতে আমি মন্তব্য করেছিলাম, 'আমার মনে হয়, ওটা আপনার কাজ নয়। আপনি তেমন ধাতেরই নন।' তিনি বিষণ্ণভাবে সায় দিয়ে বললেন ঃ 'খুব ঠিক কথা! আমি আদৌ ও ধাতেরই নই।' একটু ভেবে নিয়ে তিনি আবার বললেন ঃ 'তবু যখন মনে পড়ে, ইলিচকেও হয়ত অনেক সময়ই নিজের ইচ্ছাকে দমন করে চলতে হয়, তখন নিজের দুর্বলতার জন্যে লজ্জা পাই।' আমি বেশ কিছু শ্রমিককে চিনতাম এবং এখনও চিনি, যাঁরা যে-লক্ষ্য সাধনে ব্রতী রয়েছেন তার জন্যে তাঁদের দাঁতে দাঁত চেপে থাকতে হয়েছে এবং তাঁদের নিজেদের ইচ্ছাকে দমন করতে হয়েছে। নিজের সম্বন্ধে তিনি এত উদাসীন ছিলেন যে, এই ধরনের বিষয় নিয়ে কখনও কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। তেমনি নিজের অন্তরে কোনও ঝড় বইতে থাকলে সেটা গোপন রাখতে লেনিনের চেয়ে ভালো আর কেউ পারতেন না। একবার মাত্র, গোরকি-তে এক কমরেডের ছেলেমেয়েদের আদর করতে করতে বলেছিলেন ঃ 'এরা আমাদের চেয়ে ভালো থাকবে। আমাদের যে সমস্ত ঘটনার ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে তার অনেক কিছু এদের অজ্ঞাত থেকে যাবে। এদের জীবন অত কঠোর হবে না।'

• • •

একদিন ওঁর কাছে গিয়ে দেখি ডেস্কে রয়েছে 'যুদ্ধ ও শান্তি' বইখানা।

'হ্যাঁ তলস্তয়ই বটে! শিকারের দৃশ্যটা পড়ব ভেবেছিলাম, কিন্তু মনে পড়ল একজন কমরেডকে চিঠি লিখতে হবে। পড়ার সময় নেই একেবারেই। তলস্তয় সম্বন্ধে আপনার ছোট্ট বইখানাও পড়লাম সবেমাত্র কাল রাত্রে।' কোঁচকানো চোখে হাসি ফুটিয়ে আর্মচেয়ারখানায় আরামে গা এলিয়ে একটু গলা খাটো করে বললেন ঃ 'এ তো পাহাড়! মানুষের মধ্যে কী অতিকায় পুরুষ! হুঁ বন্ধু, একেই বলে শিল্পী ... আর জানেন, আরও একটা জিনিস দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। এই কাউন্টের আগে সাহিত্যে যথার্থ কৃষককে আর দেখা যায়নি।'

তাঁর কোঁচকানো চোখ তখনও চকচক করছে। সেই চোখের দৃষ্টি আমার উপর ফেলে তিনি বললেন ঃ 'ইউরোপে তাঁর সমতুল্য কেউ আছে, বলুন তো?'

উত্তরটা দিলেন নিজেই ঃ 'কেউ না।'

হাতে হাত ঘষে উনি স্পষ্টতই পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন।

• • •

কমরেডদের প্রতি তাঁর যত্ন আর মনোযোগের কথা আগেই বলেছি। কমরেডদের প্রতি তাঁর এই মনোযোগ তাঁদের জীবনের ছোটখাটো অপ্রীতিকর খুঁটিনাটিতেও গিয়ে পৌঁছত। কোনও কোনও বিচক্ষণ কর্মকর্তা তাঁদের অধীনস্থ যোগ্য এবং সৎ কর্মীদের প্রতি একধরনের স্বার্থপর আগ্রহ-উৎকণ্ঠা দেখিয়ে থাকেন, কিন্তু লেনিনের এই বিশেষ অনুভূতিতে সেটা কখনও দেখিনি। তাঁর এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল প্রকৃত কমরেডের যথার্থ আন্তরিক মনোযোগ, সমানে-সমানে ব্যবহারের প্রীতি। আমি জানি, পার্টিতে মহত্তম যাঁরা ছিলেন তাঁদের চেয়ে লেনিন এত বড় ছিলেন যে, তার কোনও তুলনাই হয় না, কিন্তু তিনি যেন সে-সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না, কিংবা অবহিত থাকতে চাইতেনই না। কারও সঙ্গে তর্ক করবার সময়ে তিনি শ্লেষাত্মক কথা বলতেন, বিদ্রূপ করতেন, এমনকী তাকে অতি কটু হাস্যকর অবস্থায় ফেলে দিতেন। এসবই সত্যি।

আবার অনেক সময়ে, যাঁদের তিনি আঘাত করেছিলেন, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে পরে বলতে গিয়ে তাঁদের আশ্চর্য প্রতিভা আর নৈতিক দৃঢ়তা সম্বন্ধে তাঁকে আন্তরিক মন্তব্য করতে শুনেছি। ১৯১৮-১৯২১ সালের নারকীয় অবস্থার মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয়েছে। তাঁদের চতুর্দিকে ছিল সমস্ত দেশের গোয়েন্দা আর সমস্ত রাজনীতিক পার্টির চর। সেই অবস্থায় যুদ্ধে অবসন্ন দেশের গায়ে পচা ঘায়ের মতো পেকে-ওঠা নানা ষড়যন্ত্রের মধ্যে তাঁরা কীভাবে কঠোর অধ্যবসায়সহকারে কাজ করেছেন, তাতে তাঁকে শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে শুনেছি। একটুও বিশ্রাম না নিয়ে

সাতের পাতায় দেখুন

পাঁচ বছরে বিচারাধীন ১২ হাজার বন্দির মৃত্যু

সংশোধনাগার না কসাইখানা

কোনও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র নয়, এটা বিশ্বের বৃহত্তম 'গণতান্ত্রিক' ভারতেরই ছবি। গত পাঁচ বছরেই ১২ হাজার বিচারাধীন বন্দির মৃত্যু হয়েছে এই ভারতে।

এই ভয়ঙ্কর তথ্য জানার পর সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির কাছে এর ব্যাখ্যা চেয়ে ১২ নভেম্বর এক নির্দেশ জারি করেছে। পাঁচ বছরে ১২ হাজার বন্দির মৃত্যু ছাড়াও হিউম্যান রাইটস কমিশনের নথি অনুযায়ী বিচারাধীন ৩৯ জন বন্দি ধর্ষণের শিকার হয়েছেন মাত্র ৪ বছরেই। অবশ্য নথিভুক্ত না হওয়া ঘটনার হিসেব নেই।

কমিশনের পাঁচ বছরের রিপোর্ট বলছে, অত্যাচারিতের সংখ্যা ৩ হাজার ৫৩২ জন। অথচ সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, প্রতি বছর ৬০ লক্ষ অত্যাচারিত মানুষের এফ আই আর চেপে দেওয়া হয়। কারণটা কী? ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর সাংবিধানিক বেঞ্চ বলেছে, প্রতি বছর বহু এফ আই আর নথিভুক্ত হয় না, যাতে বহু দুষ্কর্ম ছাড়পত্র পেয়ে যায়। বিচারপতি নিজ্জর ও কালিফুল্লার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, বিচারাধীন বন্দির মৃত্যু না হলে অত্যাচারের ঘটনা নথিভুক্ত করার কোনও বাধ্যবাধকতা থাকে না পুলিশের। এর থেকে একটি ভয়ঙ্কর সত্য উঠে আসে। তা হল, বাস্তবে পুলিশি অত্যাচার যত সংখ্যায় ঘটে, তার ভগ্নাংশও নথিবদ্ধ হয় না।

বিচারাধীন বন্দিদের এই মৃত্যুর ঘটনাগুলির কোনওটাই রোগভোগে বা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যু নয়। পিটিয়ে মারা, কোনও গুরুত্বপূর্ণ মামলার সাক্ষী লোপাট করার জন্য মেরে ফেলা, গুম খুন করা, অপহরণ করা— এরকম বহু ঘটনারই যোগফল অসংখ্য বিচারাধীন বন্দির মৃত্যু। এ ছাড়াও বন্দি মৃত্যুর কারণ, তাদের চিকিৎসার সুযোগ না দেওয়া এবং অস্বাস্থ্যকর আভ্যন্তরীণ পরিবেশ। অথচ গণতান্ত্রিক নীতি ও রীতি অনুসারে বন্দিদের সুরক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের। তাহলে বন্দিদশায় এত মৃত্যুর দায় তো তাদের উপরেই বর্তাবে। বাস্তব হল, শুধুমাত্র সন্দেহের বশে কত বন্দিকে গুম করে পুলিশ-মিলিটারি। নিরপরাধ কোনও বন্দি বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগেই অজানা কারণে খুন হয়ে যাওয়ার বহু ঘটনাও ঘটে। হইচই হলে অথবা পাল্টা মামলা হলে মৃত বন্দির পরিবারের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে ধামাচাপা দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। ভয় দেখিয়েও বহু ঘটনাকে প্রকাশ্যে আসতে দেওয়া হয়নি।

শুধু পুলিশ বা জেল হেফাজতে মৃত্যুই নয়, গত চার বছরে পুলিশের সাথে 'ভুয়ো সংঘর্ষে' গুজরাটের ইসরাত জাহান সহ মারা গেছে কমপক্ষে ৫৫৫ জন। সালওয়া জুডুমের মতো রাষ্ট্রীয় মদতপ্রাপ্ত অ-সরকারি সশস্ত্র বাহিনীগুলোও আজ দেশের প্রান্তে প্রান্তে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করতে খুন, ধর্ষণ, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছে। কাশ্মীরে রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা শত শত নিরীহ মানুষ ও মানবাধিকার কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন, নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছেন। পীড়নের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না সাংবাদিকরাও।

কংগ্রেস, বিজেপি সহ ক্ষমতার বৃত্তে ঘুরে বেড়ানো বিভিন্ন জাতীয় দল, ক্ষমতাসীন আঞ্চলিক দলগুলি, আইনের শাসনকে নিজেদের কবজায় রেখে নিকৃষ্ট রাজনৈতিক খেলা খেলে চলেছে। বিরোধী দলকে পরাস্ত করতে হেন উপায় নেই যা অবলম্বন করে তারা দমন-পীড়ন চালায়নি। এ রাজ্যে আইন বহির্ভূত অত্যাচার, দমন-পীড়ন, লকআপে, জেল হেফাজতে মৃত্যু, যখন তখন গুলি চালিয়ে মেরে ফেলা, তুলে নিয়ে গিয়ে নিখোঁজ করে দেওয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সিপিএম আমলে প্রভূত পরিমাণে ঘটেছে। তাদের আমলে পুলিশ অফিসার বিনোদ মেহতার হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া প্রধান সাক্ষীকে লালবাজারের লকআপে খুন করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল সে আত্মহত্যা করেছে। চটকল শ্রমিক ভিখারি পাসোয়ানকে বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করার পর তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। আজও তাঁর খোঁজ মেলেনি। কিছুদিন আগে হুগলির ধনেখালিতে শেখ নাসিরুদ্দিন নামে এক তৃণমূল কর্মীকে পুলিশি হেফাজতে পিটিয়েই মেরে ফেলা হল। স্ত্রী অভিযোগ করেছেন, পুলিশি সহযোগিতায় দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার হয়েছেন তাঁর স্বামী। এরকম অসংখ্য ঘটনা ঘটে চলেছে। একটি ঘটনারও অপরাধীদের শাস্তি হয়নি আজও।

এদেশে কিছুদিন আগে জেল বা কারাগারগুলির নাম বদলে রাখা হয়েছে সংশোধনাগার। সেটা নাকি এই উদ্দেশ্য থেকে যে, শুধুমাত্র শাস্তি দেওয়াই নয়, বন্দিদের সংশোধন করে নতুন জীবন ফিরে পেতে সংশোধনাগারগুলি ভূমিকা নেবে। কিন্তু কারাগারের নোংরা পরিবেশ, এক শ্রেণির কর্মচারীদের জুলুম-সন্ত্রাস-দুর্নীতিপরায়ণতা, ক্রিমিনাল কেসের দাগি বন্দিদের সঙ্গে সাধারণ বন্দিদের বা রাজনৈতিক বন্দিদের একত্রে রাখা, বহু জেল অফিসারের অমানবিক আচরণ, খাদ্যের নিম্নমান, চিকিৎসার অভাব, সর্বোপরি জেল সম্পর্কে শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি বন্দিদের স্বাভাবিকতা নষ্ট করে দেয়। তার উপর জেরা করার নামে পুলিশ একেকজনের উপর চালায় থার্ড ডিগ্রি অত্যাচার। অফিসাররা এতটাই বেপরোয়া হয়ে ওঠে, বহু সময় বন্দির দেহ নিথর হয়ে যাওয়ার পরেই একমাত্র তারা অত্যাচার থামায়। এই ভয়ঙ্কর ঘটনা বাকি বন্দিদের মনোবলেও চিড় ধরিয়ে দেয়। বহু বন্দি মানসিক রোগীতে পরিণত হয়। ফলে সংশোধন তো দূরের কথা, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোয় বন্দিদের সাথে যে ব্যবহার করার কথা সংবিধানেও লিপিবদ্ধ থাকে, তার ধারেপাশেও যায় না কারাগার ওরফে সংশোধনাগারগুলি।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিচারব্যবস্থাকে বলা হয় ব্যক্তি স্বাধীনতা তথা গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। সেই বিচারব্যবস্থাতেই চলছে বিলম্বিত বিচার, যা অবিচারেরই নামান্তর। একজন ব্যক্তি অপরাধী কি অপরাধী নয়, তা বিচার হওয়ার আগেই ১৫-২০ বছর সে জেলে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। এই বিচারব্যবস্থার প্রতি তাদের আস্থা থাকতে পারে কি?

মুখ্য বিচারপতি পি সদাশিবম বলেছেন, 'ক্রমবর্ধমান অপরাধ অল্প দিনের মধ্যেই আইনের শাসনকে লঘু করে দেবে এবং এর নেতিবাচক প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। কারণ, মানুষ আইনের শাসনের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে।' বিচারব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত একজন মানুষ এবং এই কানুনি ব্যবস্থার রক্ষকই বলছেন এ কথা। এই আইনের শাসন যে সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরে তৈরি হয়েছে, লালিত হয়েছে, সেই পুঁজিবাদী সমাজের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করলেই হবে না, একে ভেঙে নতুন সমাজ, নতুন আইন-কানুন, বিচারব্যবস্থার পত্তন করতে হবে। যেখানে মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখা হবে, বন্দিকে বিবেচনা করা হবে একজন মানুষ হিসেবে।

ধানের উপযুক্ত সহায়ক মূল্যের দাবি নন্দীগ্রামে

১৯ ডিসেম্বর নন্দীগ্রাম বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেয় এস ইউ সি আই (সি) নন্দীগ্রাম লোকাল কমিটি। ডিজিটাল রেশনকার্ডের ব্যবস্থা করা, মহেশপুর ও মহম্মদপুর হাসপাতালে অন্তর্বিভাগ চালু করা, বিধবা ও বার্ধক্য ভাতা মাসে ৪০০ টাকার পরিবর্তে ২০০০ টাকা করা, জবকার্ড হোল্ডারদের বছরে ২০০ দিনের কাজ ও ২৫০ টাকা মজুরি, ধানের সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি ১৬০০-১৭০০ টাকা ঘোষণা করে সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে কেনার দাবি জানানো হয়। নেতৃত্ব দেন কমরেডস মনোজ দাস, আরতি খাটুয়া, আনসার হোসেন, অসিত জানা, অসিত প্রধান প্রমুখ।

ভ্লাদিমির লেনিন

ছয়ের পাতার পর

তাঁরা কাজ করেছেন, খেয়েছেন সামান্য, তাও খারাপ খাবার। তাঁদের সর্বক্ষণ থাকতে হয়েছে উদ্বেগের মধ্যে।

• • •

একজন বলশেভিক, প্রাক্তন গোলন্দাজ সৈনিক একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। সেটা দেখবার জন্যে লেনিনকে আমি গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান সদরঘাঁটিতে আসতে বলেছিলাম। উদ্ভাবনটা ছিল বিমানধ্বংসী গোলাবর্ষণের লক্ষ্য সংশোধন করবার একটা কৌশল।

উনি বললেন, 'এ সবের আমি কী বুঝি?' কিন্তু তবু গিয়েছিলেন আমার সঙ্গে। একটু অন্ধকার মতো একটা কামরায় টেবিলের উপর যন্ত্রটাকে ঘিরে বসে ছিলেন সাত জন গুরুগম্ভীর জেনারেল, সবাই পক্বকেশ, গোঁফওয়ালা, পণ্ডিত লোক। তাঁদের মধ্যে বেসামরিক পোশাকে লেনিনকে নজরেই পড়ছিল না। উদ্ভাবক ব্যক্তি নির্মাণকৌশল ব্যাখ্যা করে বলতে আরম্ভ করলেন, দু'এক মিনিট সায় দিয়ে দিয়ে শোনবার পর লেনিন যেন কোনও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করবার মতোই সহজে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন ঃ 'নিশানা করার সরঞ্জামটা একই সঙ্গে দু'রকমের কাজ করছে কীভাবে? ঐ সরঞ্জামটায় যেটা ধরা পড়ছে তার সঙ্গে কামানের নলের কোণটাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমকালীন করা যায় না কি?' পাল্লা এবং আরও কোনও কোনও বিষয়েও তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, তাতে উদ্ভাবকারী এবং জেনারেলরা বেশ অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তর দিচ্ছিলেন। পরদিন সেই উদ্ভাবকারী আমাকে বলেছিলেন ঃ 'জেনারেলদের আমি বলেছিলাম এক কমরেডকে নিয়ে আপনি আসবেন, কিন্তু কমরেডটি কে, সেটা ওঁদের বলিনি। ইলিচকে ওঁরা চিনতে পারেননি। তা ছাড়া, কোনও আড়ম্বর ছাড়া, কোনও রক্ষী ছাড়া উনি অমনভাবে এসে পড়তে পারেন সেটা ওঁরা বোধহয় ভাবতেও পারেননি। পরে ওঁরা জানতে চাইছিলেন ঃ উনি কি টেকনিশিয়ান, অধ্যাপক? 'লেনিন' — শুনে ওঁরা নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। ওঁরা বললেন, 'ওঁকে তাঁর মতো দেখাচ্ছিল না। তাছাড়া, আমাদের এই বিষয়টা তিনি অত ভালো করে জানলেনই বা কেমন করে? টেকনিক্যাল বিষয়ে বেশ ওয়াকিবহাল হলে তবেই কেউ অমন সব প্রশ্ন করতে পারে।' ওঁরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। 'উনি লেনিন, সেটা ওঁরা বোধহয় ঠিক বিশ্বাসই করেননি।'

গোলন্দাজ সদরঘাঁটি থেকে ফিরবার পথে লেনিন হাসছিলেন, আর উদ্ভাবনকারী সম্বন্ধে বলেছিলেন ঃ 'লোক চিনতে কী ভুলই না হতে পারে! আমি জানতাম উনি একজন ভালো পুরনো কমরেড। তবে, আকাশ থেকে তারা ছিঁড়ে আনবার মতো বাহাদুর কিছু নন। কিন্তু দেখছি, উনি ঠিক তেমনিই প্রতিভাশালী। চমৎকার! কার্যক্ষেত্রে কৌশলটার মূল্য নিয়ে আমি সংশয় প্রকাশ করতে থাকলে জেনারেলদের কেমন মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছিল, লক্ষ করেছেন? আমি ইচ্ছে করেই সংশয় প্রকাশ করছিলাম, দেখছিলাম ঐ চমৎকার কৌশলটা সম্বন্ধে ওঁরা ঠিক কী ভাবছেন।'

উনি আবার হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ 'আপনি বললেন ওঁর আর একটা উদ্ভাবন আছে? তা, সেটা নিয়ে কিছু করা হচ্ছে না কেন? ওঁর আর কোনও দিকে নজর দেওয়া উচিত নয়। ওঃ, এইসব টেকনিশিয়ানকে যদি তাঁদের কাজের উপযোগী আদর্শ অবস্থা তৈরি করে দেওয়া যেত! তা হলে পঁচিশ বছরের মধ্যে রাশিয়া পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর দেশ হয়ে যেত!'

অনেক সময়েই তাঁকে লোকের প্রশংসা করতে শুনেছি। যাঁদের তিনি পছন্দ করতেন না বলা হয়, তাঁদেরও কর্মোদ্যমের প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা দেখিয়ে তিনি এভাবে বলতে পারতেন।

তিনি এমন একজন রাশিয়ান যিনি দীর্ঘকাল যাবৎ রাশিয়ার বাইরে থেকে দেশকে মনোযোগ দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। তাতে তাঁর মনে হয়েছে, দূর থেকে দেখতে আরও বেশি প্রাণবন্ত, আরও বেশি বর্ণাঢ্য লাগে। দেশের নিহিত সুপ্ত শক্তি — জনগণের অসাধারণ প্রতিভা, তখনও যার প্রকাশ হয়েছে সামান্য, যাকে ইতিহাস জাগিয়ে তোলেনি, যা তখনও চলছিল খুঁড়িয়ে, তখনও নিরানন্দ —তার নির্ভুল মূল্যায়ন করেছিলেন তিনি। তিনি দেখেছিলেন, দেশের সর্বত্র রয়েছে প্রতিভা এবং সেই প্রতিভা রাশিয়ার জীবনের বিষণ্ণ পটভূমিটাকে ছেয়ে রয়েছে সোনালী তারার মতো।

• • •

এই দুনিয়ার মানুষের মতো মানুষ ভ্লাদিমির লেনিন চলে গেছেন। যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁদের উপর বেদনাদায়ক আঘাত হয়ে এসেছে এই মৃত্যু। অতি বেদনাদায়ক আঘাত। কিন্তু মৃত্যুর কালো রেখা তাঁর গুরুত্বকে, পৃথিবীর মেহনতি মানুষের এই নেতার গুরুত্বকে সারা পৃথিবীর দৃষ্টিতে আরও বিশিষ্ট করে তুলবে।

তাঁর বিরুদ্ধে সৃষ্টি করা বিদ্বেষের মেঘ, তাঁকে ঘিরে ছড়ানো মিথ্যা আর কুৎসার মেঘ যদি আরও ঘনও হত, তবু, উন্মত্ত পৃথিবীর দম-বন্ধ-করা অন্ধকারের মধ্যে তিনি যে আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছিলেন সেটা একটুও নিষ্প্রভ হত না। সারা পৃথিবীরই কাছে এতখানি স্মরণীয় মানুষ আর কেউ নন।

ভ্লাদিমির লেনিন মারা গেছেন। কিন্তু রয়েছেন তাঁর মানসিক শক্তি আর ইচ্ছাশক্তির উত্তরাধিকারীরা। পৃথিবীতে সর্বকালের অন্য যে কোনও ব্যক্তির চেয়ে সজীব রয়েছেন, সাফল্য সহকারে সক্রিয় রয়েছেন সেই উত্তরাধিকারীরা।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

বন্ধ চা-বাগান সরকারি অধিগ্রহণ করতে হবে
দাবি চা শ্রমিকদের

রায়পুর চা-বাগান সহ ডুয়ার্সের সমস্ত বন্ধ চা-বাগানের লিজ বাতিল করে সরকারি অধিগ্রহণের দাবি জানাল এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত নর্থবেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। এই দাবিতে ১৬ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ির সমাজপাড়া মোড়ে শতাধিক শ্রমিক বিক্ষোভ অবস্থান করেন। শ্রমিকদের বক্তব্য, পুজোর আগে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, জেলাশাসককে না জানিয়ে কোনও অবস্থাতেই বাগান বন্ধ করা হবে না। কিন্তু মালিক সম্প্রতি রায়পুর বাগানটি বন্ধ করে দেয়। ফলে ৬০০ শ্রমিক কাজ হারিয়ে অনাহারের মুখে এসে পড়েছেন।

তাঁরা আরও বলেন, রাজ্য সরকার এবং বৃহৎ শ্রমিক সংগঠনের সহায়তায় মালিক বাগানের রুগ্নতার অজুহাতে শ্রমিকদের অত্যন্ত কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য করছে। এ প্রসঙ্গে এন বি টি পি ই ইউ-র বক্তব্য, উত্তরবঙ্গের চা-মালিকরা সংগঠিতভাবে অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিক ২০০০ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে কিছু বাগান বন্ধ রেখে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করছে, যাতে শ্রমিকরা মালিকদের অন্যায় বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার সাহস না পায়। কিছু ইউনিয়নও শ্রমিকদের মধ্যে বাগান বন্ধের আতঙ্ক তৈরি করতে আন্দোলনবিরোধী প্রচার করে চলেছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হলেও শ্রমিকদের দুর্গতির কোনও সুরাহা হয়নি। তাঁরা মনে করেন, চা বাগানকে রুগ্ন দেখিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে কোটি কোটি টাকা লাভ করা মালিকদের একটি কৌশল।

এই অবস্থায় ইউনিয়নের দাবি, রায়পুর সহ সমস্ত বন্ধ চা-বাগানের লিজ বাতিল করে সরকারকে অধিগ্রহণ করতে হবে, বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের সরকারি ভাতা 'ফাওলাই' দিতে হবে, সমস্ত বন্ধ চা-বাগানে ১০০ দিনের কাজ চালু রাখতে হবে, অনাহারে মৃত্যুর ঘটনায় উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনকে চাকরি দিতে হবে, বন্ধ বাগানে মেডিকেল টিম ও ত্রাণ পাঠাতে হবে, বেআইনি লক-আউটের জন্য রায়পুর বাগান মালিককে গ্রেপ্তার করতে হবে। এদিনের অবস্থানে নেতৃত্ব দেন কমরেডস সামসের আলি, সুব্রত দত্তগুপ্ত, হরিভক্ত সর্দার প্রমুখ।

মহারাষ্ট্রে শহিদ ক্ষুদিরাম জন্মদিবস পালিত

মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা জেলার আঁজি গ্রামে ৩ ডিসেম্বর স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন বিপ্লবী ধারার মহান বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ১২৪তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড বিশ্বজিৎ হারোড়ে।

একই দিনে ইয়তমাল শহরের লাগোয়া ভুসা গ্রামে ক্ষুদিরাম জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কমরেড প্রমোদ কাম্বলে। সভাপতিত্ব করেন কমরেড সঙ্গীত বারি।

কলকাতায় সাইকেল চালানোর অধিকার চেয়ে মিছিল

কলকাতার ১৭৪টি রাস্তায় সাইকেল চালানোর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও আরোহীদের উপর পুলিশি অত্যাচার বন্ধের দাবিতে ১৭ ডিসেম্বর সাইকেল আরোহী অধিকার ও জীবিকা রক্ষা কমিটির আহ্বানে কলকাতায় এক সাইকেল মিছিল হাজরা মোড় থেকে শুরু হয়ে বিড়লা তারামণ্ডলে শেষ হয়। মিছিলে গণেশ টকিজ ও শিয়ালদহ বাজারের দুধ বিক্রেতা, বেকারি, কুরিয়ার সার্ভিস, ওষুধ সরবরাহকারী, মাছ-সবজি বিক্রেতা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হোম ডেলিভারি, অল্প বেতনের চাকরিজীবী ও বিভিন্ন পেশার পাঁচ শতাধিক সাইকেল আরোহী অংশ নেন। এছাড়াও বহু সাধারণ মানুষ মিছিলে যোগ দেন। এতে পা মেলান রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন ভারতীয় মহিলা ফুটবলার শান্তি মল্লিক।

পরে দুঃখশ্যাম মণ্ডলের নেতৃত্বে পাঁচ জনের প্রতিনিধিদল পরিবহণ মন্ত্রী মদন মিত্রের সঙ্গে দেখা করে দাবিপত্র জমা দেন। মন্ত্রী জানান, গত ৪ জুন পুলিশ কমিশনার কলকাতার রাস্তায় সাইকেল চালানোর উপর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত একটি নোটিশ সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সরকার তা অনুমোদন করেনি। ফলে এখন সাইকেল চালানোর উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। তাহলে সাইকেল আরোহীদের পুলিশ এখনও ধরছে কেন জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, পুলিশ যদি কোনও সাইকেল ধরে, তবে পরিবহণ দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারি অরবিন্দ সিং-এর কাছে সাইকেল আরোহীরা যেন অভিযোগ জানান।

মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের কাছে নিরাপত্তার দাবি নার্সেস ইউনিটির

১৮ ডিসেম্বর নার্সেস ইউনিটির ডাকে কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলার সরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত পাঁচ শতাধিক নার্স এন আর এস হাসপাতাল থেকে মিছিল করে এসপ্ল্যানেডে সমবেত হন। অ্যাপ্রন পরিহিত নার্সদের এই মিছিল পথচলতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁদের দাবি ছিল, পরিকাঠামোগত দুর্বলতা আড়াল করতে নার্সিং কর্মচারীদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না, এন আর এস মেডিকেল কলেজে অন্যায়ভাবে সাসপেন্ড হওয়া নার্সকে অবিলম্বে কাজে ফিরিয়ে আনতে হবে, কেন্দ্রীয় হারে বা অন্তর্বর্তীকালীন ন্যূনতম ডিপ্লোমা স্কেলে ডিপ্লোমা হোল্ডার নার্সদের বেতন নির্ধারণ করতে হবে, এ এন এম (আর) থেকে ডি ডি এইচ এস (নার্সিং) পর্যন্ত বেতন কাঠামোর যথাযথ পুনর্বিন্যাস করতে হবে, নতুন পোস্টিং-ট্রান্সফার-প্রমোশন পলিসি স্থগিত করতে হবে, হাসপাতালে বিনামূল্যে পথ্য ও জীবনদায়ী যাবতীয় ওষুধপত্র ও চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হবে, চুক্তিপ্রথা বাতিল করে সমস্ত স্তরে স্বাস্থ্যকর্মীদের স্থায়ী পদে নিয়োগ করতে হবে, নার্সদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিস্টার্স পার্বতী পাল, প্রীতি তারণ, ভাস্বতী মুখার্জী, কাকলি দেওয়ান প্রমুখ। ৪ জনের প্রতিনিধি দল রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাঁদের প্রতিনিধিদের নিকট দাবিপত্র পেশ করেন।

রানাঘাটে জনস্বাস্থ্য রক্ষা সম্মেলন

১৫ ডিসেম্বর হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের রাণাঘাট মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে এবং হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসার দাবিতে উত্থাপিত প্রস্তাবকে সমর্থন জানান ডাঃ সমীর রায়, অচিন্ত্য দেবনাথ, কালিপদ দেবনাথ, সঞ্জয় দাস। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত, সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস। সম্মেলনে উপস্থিত চিকিৎসকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডাঃ সুদীপ সরকার, ডাঃ নীলকান্ত সরকার, ডাঃ অপূর্ব রায়, ডাঃ সত্যজিৎ রায়। ডাঃ সত্যজিৎ রায়কে সভাপতি ও শীতল দে-কে সম্পাদক করে ৩৮ জনের কমিটি গঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় অফিস পুনর্নির্মাণ তহবিলে সাহায্য করুন

জনগণের ন্যায্য দাবি নিয়ে সর্বদা প্রতিবাদ ও আন্দোলনে নিয়োজিত সংগ্রামী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পুরনো কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের স্থানে নতুন ভবন নির্মাণ শুরু হয়েছে।

বহু পুরনো এই বাড়িটি ভগ্নপ্রায় অবস্থায় পৌঁছেছিল। দলের বর্তমান কাজের ও সংগঠনের বিস্তৃতির বিচারে স্থানও যথেষ্ট কম ছিল। এই অবস্থায় দলের সকল রাজ্যের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা চেয়েছেন পুরনো ভগ্নপ্রায় বাড়িটির স্থানে নতুন অফিস ভবন নির্মাণ করা হোক। সেইমতো নতুন ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় কমিটি।

মূলত দলের নেতা-কর্মী-সমর্থক-দরদিদের দেওয়া অর্থসাহায্যেই বাড়িটি ক্রয় করা ও প্রাথমিক নির্মাণকাজ শুরু করা সম্ভব হয়েছে। বাকি অংশ সম্পূর্ণ করার জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন। তাই জনগণের কাছে আমরা অর্থ সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি। এই উদ্দেশ্যে দলের কর্মীরা রাস্তায় ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে আপনাদের কাছে আবেদন জানাবেন।

আমরা বিশ্বাস করি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সকল কর্মসূচি সফল করতে জনগণ পূর্বাপর যেভাবে অর্থসাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, এবার কেন্দ্রীয় অফিস ভবন নির্মাণের জন্যও তাঁরা মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করবেন।

অভিনন্দন সহ
দেবপ্রসাদ সরকার
অফিস সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি

৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯১৮২৮, ৯৪৩৩০৮৪১৯৪
চেক দিতে হবে এই নামে ঃ
Socialist Unity Centre of India (Communist)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in